হট্টমালার
লীলা মজুমদার
দেশে

পয়লা তারিখে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওরা এ বাড়ি ভেঙে ফেলে, এখানে পাঁচতলা অতি আধুনিক দুটো বাড়ি তৈরি করবে। তার বদলে এ বাড়ির ১৩ জন ওয়ারিশের প্রত্যেককে সল্ট লেকে ওদেরই তৈরি একটা করে বড় ফ্ল্যাট আর কত লাখ টাকা দেবে বলে শুনেছিলাম। ঠিক মনে নেই। ৮২ বছর বয়স হল সব কথা কেমন গুলিয়ে যায়। যা সত্যি ঘটেছিল, যা ঘটতেও পারত আর যা ঘটলে আমি খুব খুশি হতাম, মাঝেমাঝে তার তফাৎ করতে পারি না। তবে এটা জানি ১৩ জন ওয়ারিশ সবাই সমান ভাগ পাবে। যারা সল্ট লেকে ফ্ল্যাট নিতে চায় না, তারা নাকি তার দাম পাবে। সে ফ্ল্যাট যে দামে বিক্রি হবে, তাই। নাকি অনেকগুলো টাকা, তবে কত তা ভুলে গেছি। আচ্ছা, সল্ট লেকের বদলে নোনাপানি নাম কেমন হয়?

হয়তো ভালোই হবে; কারণ সত্যি কথা বলতে কি উড় স্ট্রীটের এই দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িটার খুব নড়বড়ে অবস্থা। সামনে দিয়ে ট্রাক গেলেই লট্‌খট্‌ শব্দ হয় আর দুপুরের কড়া রোদে কত সময় ভেবেছি বাড়িটা গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বাড়িটার নিজস্ব একটা প্রাণ আছে কি না কে জানে। শুনেছি দেড়শো বছর এর বয়স। আমার নাতনিরা বলে, 'বাড়ি ছেড়ে যেতে বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?' বলি, 'না রে। ওর এবার সময় হয়েছে। কষ্ট হবে কেন? আমারও ৮২ বছর বয়স হয়েছে, তুলিটা রংটা কালি-কলমটা নিয়ে যেই বসি

তখন আর বয়স বলে কিছু থাকে না। কিন্তু দেখিস, যেই আমার সময় হবে, তুলি-কলমটা নামিয়ে রেখে অমনি চলে যাব।'

সোমা বলে, 'তাহলে যেদিন থেকে বাড়ি বিক্রির কথা পাকা হল, সেদিন থেকে এ-ঘর, ও-ঘর সব ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করো কেন? কি খোঁজো? কোথাও কোনও গোপন কুঠুরি ভরা হীরে নেই। বাবা-জ্যাঠারা ঠুকে ঠুকে সব দেখেছে। বিক্রির কাগজ সই হয়ে টাকা কড়ির লেনদেন হয়ে গেলেই, ওরা সব কিছুর মালিক হবে। এর দেয়ালের ইঁটেরও নাকি অনেক দাম। দরজা জানলা, কাঠের কড়ি-বর্গা, মেঝের মার্বেল, টালি, সব কিছুর আগুন-দর। জানতে এ-সব? আমরা সবাই বড়লোক হয়ে যাব। তুমিও। অত টাকা দিয়ে কি করবে তারই ঠিক নেই, তার ওপর আবার কি খোঁজো?'

কি খুঁজি কেমন করে বলি ওদের? ভাঙাভাঙা টুকরো টুকরো কথা খুঁজি, কত ছোট বড় সুখ, কত দুঃখ। ৬০ বছর কি চাট্টিখানিক কথা? একটা খুদে মনে ধরে না সব, উপচে পড়ে, ঘরে দোরে লেগে থাকে। দেখলে পর, আবার মনে পড়ে। যতটা পারি মনের মধ্যে জড়ো করি। ১৯২৮ সালে আমি এবাড়িতে আসার আগের ৯০ বছরের কথা জানে এই দেয়ালগুলো। বলে, কি খুঁজি? খুঁজলেও নাকি কিছু পাব না। পেয়েছি কিন্তু। আমার শোবার ঘরের পাশের ছোট কাপড় ছাড়ার ঘরের দেয়াল আলমারির সবার ওপরের তাকে ঐ ষাট বছরের সুখদুঃখের খানিকটা খানিকটা খুঁজে পেয়েছি। হলদে হয়ে যাওয়া পাতা; ফিকে হয়ে যাওয়া কালি; গোড়ায় দু-চার জায়গায় ধেবড়ে গেছে; চোখের জলে কি না কে জানে। আবার মাঝে মাঝে বেলফুল চাপ খেয়ে, শুকিয়ে, প্রায় অবিকৃত অবস্থায় ধরা রয়েছে। নাকে একটু সুগন্ধও এলো। হয়তো ১৫০ বছরের সুগন্ধ; সুখ দুঃখের গন্ধ। ওটিকে সঙ্গে নিয়ে সল্ট লেকের বাড়িতে যাব। আমার বুড়ো আইমার জীবনের সুবাস। বলে কি না

খুঁজলেও কিছু পাব না।

সোমা, রুমা, দিয়াকে বলি, 'কোনও দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি না রে। এত দিয়েছেন বিধাতা; আমার আকণ্ঠ ভরে আছে। দুঃখ দিলেও হাত পেতে নেব। বুক ভরে সব নিয়ে যাচ্ছি।'

ডাইরিটা কি ভাবে পেলাম তা ভাবা যায় না! রাতে মনে হল পরপর অনেকগুলো ভারী ট্রাক বাড়ির পাশ দিয়ে গেল, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেত। এখন আবার কেন যাচ্ছে কে জানে। বাড়িটা দুলতে লাগল। ভাবছিলাম, উঠে সবাইকে জাগাই, এমন সময় হয় শেষ ট্রাকটি পার হয়ে গেল, নয়তো আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে দেখি ছোট ঘরের আলমারিতে ওপরের সেগুন কাঠের বইয়ের থাকটার পিছন দিকটা ঝুলে পড়েছে আর সেখানে রয়েছে একটা মাঝারি মাপের নোটবই আর তার পাশে একটা মস্ত হীরের আংটি। আমি তো থ'। কাউকে কিছু বলিনি। মেয়েদের আংটি। হয়তো আইমার। আইমা কে বুঝলে তো? আইমা হলেন আমার দিদিশাশুড়ির শাশুড়ি। তাঁকে চোখে দেখিনি, ঐ যা শুধু নাম শুনেছি জয়ন্তী। সুন্দর নাম জয়ন্তী। এ-বাড়ির প্রথম কর্ত্রী। তাঁর দাপটে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। এই তাঁর হাতের আংটি। আর খাতায় তাঁর মনের কথা। জয়ন্তী আমার দিদি শাশুড়িকে হাতে করে গড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ কখনও তাঁর মনের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। আজ বোধ হয় আমি পারব।

দুদিন পরে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, মন আমার তৈরি হয়েছিল। ৬০ বছর সুখে বাস করেছি এখানে। এত সুখ যে দুঃখগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি। আঘাতগুলো লাগল যখন, তখন তো কষ্ট হয়েইছিল। আবার সেগুলোকে বুকের মধ্যে পুরে রেখে দ্বিগুণ দুঃখ পেতে আমি রাজি নই। শেষ পর্যন্ত তো বিধাতার যেমন ইচ্ছা তাই হবে, আমি কেন মিছে ভেবে মরব। কলিযুগ নাকি শেষ হতে চলেছে, এখন দুনিয়াটাকে দারুণ সর্বনাশের

সামনে পড়তে হবে, তারপর সব কিছুর সুরাহা হয়ে যাবে। অন্ততঃ আমার বিলিতি ডক্টরেট পাওয়া, বিলেত বাসী দেওরপো তাই বলে। তার গলায় দেখলাম সোনার চেনে একটা কালো মতো পাথর ঝুলছে, নাকি ভারী পয়মন্ত। ওর মেমবৌয়ের বাপ ওরই জোরে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছিলেন। দেখি আমার বুড়ো আইমা কোন বিষয় কি লিখে গেছেন। ভাবি সব মেয়ের মন একরকম, কেবলই অবলম্বন খোঁজে, আশ্বাস চায়, সাহস চায়। এমনিতে না পেলে মনগড়া কিছু আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়। আসলে বড় বেশি ভালোবাসে, মানুষজনকে, জিনিসপত্রকে। তাই মনটা কেবল হারাই হারাই করে। লোহা পরে, শাঁখা পরে, সন্ধ্যা দেয়, শাঁখ বাজায়, দেবতাকে পর্যন্ত ঘুষ দেবার চেষ্টা করে। ভয় দিয়ে ঘেরা মেয়েদের জীবন; মনটা বড় নিঃস্ব। আজকাল লেখাপড়া শেখে, চাকরি বাকরি করে, সমান অধিকার পায়। তবু ভয় যায় না। বাইরে থেকে সব সময় মালুম দেয় না; অন্তরটা ধুকপুক করে। স্বামীর গলায় সোনার চেনে রক্ষাকবচ ঝোলায়।

ঐ খাতাটি এককালে গাঢ় লালরঙের ছিল, তাতে সোনালি জলে ইংরিজিতে লেখা 'জার্নেল'। ৩৬৫ দিনের ৩৬৫টি পাতা। মনে হয় উপহার পাওয়া। পাতাগুলি হলদে হয়ে গেছে, দুমড়োলেই ভেঙে যাচ্ছে। সাল তারিখ নেই, খালি বারটি লেখা। সবুজ কালিতে লেখা। কোনও কোনও জায়গায় ধেবড়ে গেছে, চোখের জলে কি না কে জানে। কোথাও একটি বেলফুল চাপা, কাগজের মতো পাতলা, কিন্তু একটুখানি সুগন্ধ লেগে আছে। এসবতো আগেও বলেছি। একটি দিনলিপি বই তো নয়। কিন্তু দিনলিপির মুখোস থাকে না। নিজের সঙ্গে নিজে সে মন খুলে কথা কয়। এবার আমিও সে কথা শুনব। আমি ১৯ শতকের প্রথম অর্ধেকের মুখোমুখি হব। কিন্তু এখানে বসে হবে না। সল্ট লেকে গিয়ে তবে পড়ব। এখানে এক দণ্ড একা থাকতে পারি না। ষাট/বাষট্টি বছরের প্রতিধ্বনিতে

কানে তালা লাগে।

আর আংটিটা? ভালোবাসার মানুষকে লোকে অমন আংটি দেয়। খুব সুন্দর আংটি, মুকুটের মতো সেটিং, আলো পড়লে নীল আলো ঠিকরোয়। এ আংটি পরার যোগ্য কে ছিল? তাকে যে ভালোবাসত সে-ই এ আংটি দিয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমন জিনিস কেউ নিজের জন্য কেনে বলে মনে হয় না। মনটা ভারী হয়ে যায়। ভালোবাসার চিহ্নই যদি হবে, তাহলে গর্ব করে সারা জীবন পরে বেড়িয়ে, যাবার সময়ে নিজের ছেলের বৌয়ের আঙুলে পরিয়ে না দিয়ে, এমন করে একটা ছোট ঘরের দেওয়ালের গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রেখে যাওয়া কেন?

প্রথম পাতায় নাম দেখেছি; বাংলায় লেখা জয়ন্তী—মধুরিমা দেবী। তার তলায় লেখা রিমা চৌধুরী। তার তলায় ইংরিজি হরপে RIMA— সবটা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে ধেবড়ে গেছে। চোখের জলের ফোঁটা কি? তাহলে তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়ত? নানির কাছে শুনেছি, তাঁর শাশুড়ির ভয়ে পান থেকে চুণ—খসতে পেত না। এ বাড়িতে সেকালের পুরনো সাহিবিয়ানার ভিৎ আরও শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছিল। নানি হলেন গিয়ে আমার দিদিশাশুড়ি, তাঁকে গাউন পরালে মেম বলে ভুল হতো। পুরনো ফটো দেখেছি। কর্সেট পরা সরু কোমর। বাঁ কাঁধে নক্সা কাটা স্কার্ফ; আঁচলের মতো ব্রুচ আঁটা; মাথায় তিনকোণা লেসের ভেল। সেটা চুলের সঙ্গে খুদে দুটো সোনার পিন দিয়ে আটকানো। চুলগুলো মাথার ওপর তুলে বাঁধা। তার ওপর ভেলটি লাগানো। দুই পিনে দুটি খুদে সোনার পাখি, তাদের মুখে দুটি মুক্তো ধরা। পাখি দুটি ৫ ইঞ্চি লম্বা চেন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। শেষ বয়সে নানি তাঁর গয়নার বাক্স খুলে আমাদের ওটি দেখাতেন। বলতেন, ওকে টুইন্-পিন্ বলে। নাকি বিয়ের প্রতীক। প্রথমবার শুনে অবাক হয়েছিলাম মনে আছে। সোনার শিকল দিয়ে জোড়া দুটি পাখি, তাঁদের ঠাঁই হল এ-ওর কাছ

থেকে ৫ ইঞ্চি তফাতে! ঐ টুইন্-পিন বড়মা তাঁর বড় নাতনিকে দিয়েছিলেন। সে আবার সেকেলে বলে সেটাকে সামান্য দামে বেচে দিয়েছিল। নাকি বিলিতি জিনিস, সোনা ভালো না। বিয়ের প্রতীক বটে। দু পাখি দু-দিকে মুখ করা, মধ্যিখানে পাঁচ-ইঞ্চি শিকল। উড়ে পালাবার জো নেই।

পাখির পায়ে কি কখনও শেকল দিতে হয়? মনে আছে ৬০ বছর আগে এই বাড়ির একতলায় দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়ে বসা নানা রঙের পাখি থাকত। তখনকার বড়লোকরা নানা রঙের, নানা জাতের তোতা পাখি পুষতেন। সারা দিন তারা দাঁড়ে বসে কল-গজানো ছোলা আর নানারকম দামি দামি ফল খেত আর সন্ধ্যেবেলা ঠিক সূর্য ডোবার আগে আকাশের ফালির দিকে চেয়ে ডানা ঝাপটাত। তারপর ঘাড়ে মুখ গুঁজে ঘুমোত। গোড়ায় বুঝিনি, পরে মনে হতো নীল আকাশের জন্য ওদের প্রাণ নিশ্চয় আকুল হয়। ছাড়া পাখিরা যখন ডানা মেলে বাসায় ফেরে, বাঁধা পাখির প্রাণও ঘরে ফেরার জন্য আঁকুপাঁকু করে। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় আর সইতে না পেরে, সব দাঁড়ের পাখিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার জন্য অনেক কষ্টও পেতে হয়েছিল। আরও মনে পড়ে আমার ১৩ বছরের ভাগ্নে নিমাই তার দাদামশায়ের পেয়ারের লালনীল রঙের হীরেমণ পাখির পায়ের শেকল সুপুরি কাটার নতুন জাঁতি দিয়ে কেটে দিয়েছিল। পাখি উড়ে গেছিল। তার দাম ছিল নাকি ১ হাজার টাকা। সে হল এখনকার ১০ হাজারের সমান। তখন হাজার টাকা ছিল অনেক টাকা। লাখপতি বলতে বোঝাত বেজায় বড়লোক। সে যাই হোক ভাগ্নের কান পাকড়ে সবেমাত্র দাদু চড় তুলেছেন, এমন সময় হিমসাগর আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে কে বলে উঠল 'হীরেমণ' আর এক ঝলক লালনীল রং নিয়ে পাখি নিজে এসে দাঁড়ে বসল। দেখে দাদু তো হাঁ! নিমাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হায় হায়, মুক্তির আস্বাদ ও ভুলে গেছে! ওর পায়ে আর শেকল পরাবার

দরকার নেই রে।' ঐ হীরেমণ আমাদের বাড়িতেই আরও ত্রিশ বছর ঐ রকম ছাড়া অবস্থাতেই ছিল। তারপর একদিন সকালে দেখা গেল ঐ দাঁড়ের পায়ের কাছে এক গোছা লাল নীল ফুলের মতো পড়ে আছে।

পুবের বারান্দাটি ছিল পাখিদের স্বর্গ। আমি ওখানে সেলাই ফোঁড়াই, কালি-কলম নিয়ে কত সকালবেলা যে কাটিয়েছি তার লেখাযোখা নেই। ওর পাশে ছয় হাতি চওড়া একটা গলি, তার ওধারে ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল, তার পিছনে পাশের সবজিবাগান। সেখানে দুটো মালি বিট গাজর লেটুস স্পিনার্চ ইত্যাদি বিলিতি সবজি ফলাত। ডক্টর বাসু রঙিন বেতের ঝুড়িতে করে নিজের হাতে দিয়ে যেতেন আর আমার শ্বশুরমশাইকে বলতেন, 'একটু মাছ কিম্বা চিকেন, তার ওপর এক চা-চামচ মেয়নেজ আর আমার এই তরতাজা তরকারি পটাশিয়াম পার মাঙ্গানেটে ধুয়ে—বলা তো যায় না ঐ সব কাঁচা ফার্টিলাইজার নিয়ে কারবার—কচ্‌কচ্ করে খেয়ে নেবেন। পরে একটা ফল আর এক গেলাস দুধ কি ঘোল। ব্যস্ আর কি চাই! তাই খেয়েই আমি এখন ৭০ বছরের ইয়ংম্যান আছি! চলি ব্রাদার। সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট, বেলা ১টায় লাঞ্চ, ৪টায় টি আর ডিনার অ্যাট এইট। এই হল গিয়ে চিরযৌবনের গূহ্য মন্ত্র!' এই বলে হাসতে হাসতে, তীরের মতো সোজা কর্মঠ শরীরটা নিয়ে বাড়ি চলে গিয়ে, তেমনি এক গাল হেসে ছেলের বৌকে বললেন, 'সুখী চৌধুরীদের অমর হবার মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে এলাম, মা।' তারপরেই একটু চমকে উঠে বললেন। 'এ্যাঁ, ডাকছ নাকি?' বলেই ঝুপ করে বসবার ঘরের কার্পেটের ওপর পড়লেন আর স্বর্গে চলে গেলেন।

নাতনিরা বলে, 'খালি বাড়িতে কি দেখে বেড়াও? কি খোঁজো? ওরে খুঁজতে হয় না রে। তারা নিজেই সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়। আসবাবপত্র বের করে নিয়ে কতক অ্যান্টিক বলে বিক্রি হয়েছে, কতক সল্ট লেকে গেছে। লাইব্রেরির পশ্চিমের দেয়াল-জোড়া

কনসোলটি আমি চার অংশে খুলে নিয়ে সল্ট লেকের বসবার ঘরের আর খাবার ঘরের মধ্যিখানের দেয়ালটি তৈরি করিয়েছি। দুটি অংশের এদিকে মুখ, দুটির ওদিকে মুখ। পঞ্চাশ বছর আগে এই কনসোলে আমিই নক্সা এঁকে, বুড়ো আমজাদকে দিয়ে করিয়েছিলাম। এর মধ্যে উড্ স্ট্রীটের এই সায়েব বাড়িতে প্রথম আমদানি-হওয়া বাংলা বই ঠাঁই পেয়েছিল। আগাগোড়া পাকা মেহগিনির জোড়ের কাছে একটা সুতো গলবার জায়গা ছিল না। ৫০ বছর পরে ঐ আমজাদেরই আধাবয়সী নাতি আমজাদের ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি দিয়ে কনসোল খুলে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। এতটুকু টস্কায়নি, এমন কি তাজা বার্ণিশের গন্ধটুকুও লেগেছিল। তবে কাঠের গায়েই লেগেছিল, নাকি আমার মনের মধ্যে লেগেছিল, সেটা বলতে পারছি না। বলেছিই তো বাস্তব কথা আর মনের কথা আর মন-গড়া কথা গুলিয়ে যায়।

তবে পুবের বারান্দার পাশের ঐ পাঁচিলটি তো আর মন-গড়া নয়। ওটি ভেঙে ফেলে নিশ্চয় নতুন ফ্যাশানের নক্সা করা দেয়াল হবে। তাহলে শত শত পাঁচিলবাসিন্দাও গৃহহীন হবে। ঘরোয়া পাখিদের মনে একটা ঘরছাড়া ভাব থাকে তা কে না জানে। এক এক বছর সুবিধে মতো জায়গা বেছে নিয়ে সাধ্য মতো বাসা বেঁধে, ডিম পেরে, নিরাপদে বাচ্চা তুলে, তারা উড়তে শিখলেই চিরকালের মতো বাসা ফেলে চলে যায়। আসছে বছর আবার সেখানেই কিম্বা সুবিধা মতো অন্য জায়গা বেছে বাসা বাঁধবে। এ পাঁচিলে পাখিরা রোদ পোয়ায়, পোকা খুঁটে খায়। খসে যাওয়া ইঁটের ফাঁকে খাসা বাসা করা যায়, কিন্তু পাঁচিলে বেড়াল হাঁটে। ল্যাজ খাড়া করে কতবার একটা সাদা-হলুদ ডোরাকাটা হুলোকে দেখেছি, কখনও বা সঙ্গে ৩/৪ জন ল্যাজ খাড়া করা অনুচরও দেখেছি, পাঁচিলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে। তারা আসছে টের পেলেই পাঁচিলবাসিদের মধ্যে একটা সর-সর পালা-পালা সাড়া পড়ে যায়। ফাঁক-ফোঁকর থেকে

বুড়ো একচোখ কাণা গিরগিটি বেরিয়ে এসে এক লাফে মোটা নিষ্ফলা তাল গাছে চড়ে যায়, বহুরূপী গলার কলার ফুলিয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে গুরু গম্ভীর চালে পাঁচিল থেকে নেমে গেল। কাঠবেড়ালীরা ফোকরে বাচ্চা পাড়ত। এরা সব যাবে কোথায়। আর ঐ সব শিংওয়ালা গুবরে পোকা ধরনের জানোয়াররা, তাদের কি গতি হবে? মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার পরেই ভাবি, অত ভাবনার কিছু নেই বোধহয়। শুনেছি ও পাঁচিল আমাদের তৈরি নয়, ডঃ বসুরা যাদের কাছ থেকে বাড়ি কিনেছিলেন, তারা তৈরি করেছিল।

নাতনিরা ভারী উৎসুক ছিল, ঐ কনসোল খোলার সময়ে। ভাবত না জানি কি বেরোবে ওর মধ্যে। পাথরের, রূপোর, চন্দন কাঠের, কাচের, কত যে সুন্দর সব খেলনা আর সাজাবার জিনিস বেরুল। বড়রা যে যারটা চিনে নিল। একটা পোস্টকার্ডের মাপের পুরু কাগজে, ক্রেয়ন দিয়ে আঁকা একটা ছবি ছিল। তার নীচে লেখা ছিল ফিকে হয়ে যাওয়া আঁচড়ে—জয়ন্তী। তখনও জয়ন্তীর ডাইরি খুঁজে পাইনি। জয়ন্তী কেমন বুঝে উঠতে পারিনি। এবার তাকে চিনলাম, অসুখী অসহায়া সপ্তদশী সুন্দরী। এত বড় বাড়িকে লোহার রাজদণ্ড দিয়ে শাসন করার সাহস কিম্বা শক্তি সে কোথায় পেয়েছিল! উল্টে দেখেছি পিছনে ফিকে কালিতে লেখা ১৮৩৭। বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠেছিল। জয়ন্তীকে বুঝতে হবে। ডাইরির সঙ্গে ছবিটি আমার ছোট সুটকেসে, কলম, চশমা, মানিব্যাগের সঙ্গে রেখে দিয়েছি।

জয়ন্তী। যাঁর বিষয়ে একটা ভালো কথা শুনিনি। নাকি তেজি, ঝাঁঝাল, কড়া, নির্মম, একগুঁয়ে, যা ধরতেন তা মরে গেলেও ছাড়তেন না। এসব তাঁর একমাত্র ছেলের বৌ আমাকে বলেছিলেন। তবে তিনিও কি বলতে কি বলতেন তার ঠিক নেই। অর্ধেক কথা ভুলে যেতেন, তখন মনগড়া জিনিস দিয়ে ফাঁক ভরতেন। কিন্তু জয়ন্তীকে যে ভালোবাসতেন না, তাতে সন্দেহ নেই। হঠাৎ একদিন

বলেছিলেন যে যারা অযোগ্য হাতে অঢেল ক্ষমতা পায়, তাদের মাত্রা জ্ঞান থাকে না। সেকালে উড় স্ট্রীটের চৌধুরী বাড়িতে আর সায়েব-বাড়িতে রূপে-গুণে কোনও তফাৎ ছিল না। আর জয়ন্তী এসেছিল বাগবাজারের নামকরা অতি গোঁড়া, অতি শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ঘর থেকে। তাদের মেয়েরা সেলাই করা জামা পরত না। কাঁচি ঠেকালেই কাপড় এঁটো হয়ে যায়, তা কে না জানে।

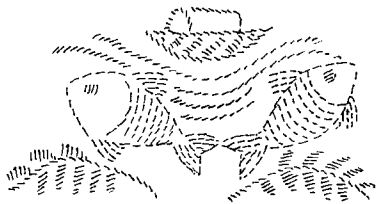

সল্ট লেক নাম আমার মনে ধরে না। ঐ যে বললাম, আমি হলে নাম দিতাম নোনাপানি। মনে পড়ে চল্লিশ বছর আগে এর কেমন চেহারা ছিল। তারও অনেক আগে শুনেছি বিদ্যাধরী নদী গঙ্গার মতো কলকল করে সাগর অবধি বয়ে যেত। তারপর চড়া পড়ল, স্রোত কমল, ছিল নদী, হল জলা। এক কালে নাকি সুন্দরবনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল এ জায়গার। বনবাদাড়,বড় বড় গাছ, তা বাঘ আসবে না-ই বা কেন? চল্লিশ বছর আগেই বন-জঙ্গল কেটে সাফ। তখন এখানে সরকারি মৎস্য-প্রকল্প হয়েছে। আমরা দল বেঁধে চড়িভাতি করতে গেলাম। বড় খালের ধারে গাড়ি থেকে নেমে দেখি খালের ওপর আড়ভাবে লম্বা লম্বা মাছ ধরার ছিপ ভাসিয়ে পুল তৈরি হয়েছে। তার ওপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে ওপারের উঁচু পাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তার ওপারে টলটল করছে মৎস্য-প্রকল্পের ছোট ছোট বাঁধ দেওয়া, তাকে জলাই বলি, কি নদীই বলি।

মৎস্য-প্রকল্পের অতিথি হয়ে গেছি, আদর যত্নের অভাব ছিল না। তা খুদে খুদে বাঁধ কেন? না, নানা বয়সের মাছদের আলাদা করার জন্য। কিছু জালের বেড়াও দেখলাম। ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে, জলের ওপর ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। মনে হল এ এক নতুন জগতে এসেছি। মৎস্য-প্রকল্পের বড়বাবু বললেন, 'তা একরকম নতুন জগৎ বই কি। এখানে সুন্দর রায়ের মন্দির আছে।

মৎস্যজীবীরা তাঁর ভক্ত। যদিও তিনি হলেন গিয়ে বেঘো দেবতা, অনেকে তাঁকে বলেন বড় মিঞা। মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। রোজ সন্ধ্যা দেওয়া হয়। এখানে রাজবংশীদের বাস, মাসিমা। তাদের হালচাল বড় সুন্দর। দেখবেন তাঁদের ঘরে আতিথ্য পেয়ে।'

ফিরবার আগে একটা দ্বীপে নৌকোগুলো লাগিয়ে মাঝিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরদোর দেখেছিলাম। ওরা আমাদের মাছ ভেজে খাওয়াল। গাছ থেকে ডাঁশা পেয়ারা আর ডালিম পেড়ে দিল। চলে আসার আগে মনে পড়ে ওদের কিছু দিতে চেয়েছিলাম, বুড়ো মাঝি হাত জোড় করে বলল, 'অতিথি খাওয়াবার কপাল করে আসিনি, মা। এ হল সরকারি মাছ। কিছু যদি দিতে চান তো সরকারকে বলবেন আমাদের যেন ঘরছাড়া না করেন। এত বড় দুনিয়াতে মা, রাজবংশীদের দাঁড়াবার একটু ঠাই নেই, এই বড় দুঃখ। একটু বলবেন তাঁদের।'

আমাদের সঙ্গে সরকারি আধিকারিক ছিলেন, তিনিও বললেন, 'জলার এ দিকটা সরকার অধিগ্রহণ করছেন; মধ্যবিত্তদের আবাস হবে। দক্ষিণ অংশটা হয়তো বেঁচে যাবে। বলা যায় না। মাছ-চাষ তো আর বন্ধ হতে পারে না।'

কিছু লেখালেখি ধরা-ধরি করা হয়েছিল; কোনও লাভ হয়নি। সেই জলাটা বুজিয়েই মনে হয় সল্ট লেক হয়েছে। সে-দিন সল্ট লেক প্রথম দেখতে গেছিলাম, কিছুই চিনতে পারিনি। সুন্দর সুন্দর পথ-ঘাট, পার্ক, বাড়ি-ঘর। ঠিক মধ্যবিত্তদের জন্য হয়তো নয়, মনে হল কিঞ্চিৎ উপরে তার চাইতে। সেইখানেই আমিও শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। ৩০/৪০ বছর আগে সে-কথা কি ভাবতে পেরেছিলাম! কোথায় গেল তারা কে জানে? ও-সব মানুষ কি আর বস্তিতে থাকতে পারে? সেবার তাদের সেই পুরনো আস্তানায় দেখেছিলাম ইল্‌সে-শুঁড়ি বিষ্টি নামল আর মাছগুলো জল থেকে ৪/৫ হাত উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে লাগল। মাঝিরাও হেসে আবার

তাদের জলে ফেলে দিতে লাগল। কোথায় গেল তারা? ওদের সেই পুরনো আস্তানার কাছে মস্ত বড় খেলার স্টেডিয়াম হয়েছে, উঁচু উঁচু প্রাসাদের মতো বাড়ি হয়েছে। ঐ সল্ট লেকেই দেখে এলাম একটু খোলা জায়গায় যারা মেরাপ বাঁধছে তাদের হাতে ভালো ভালো হাতঘড়ি। আমাদের নতুন ফ্ল্যাট দুটি দোতলার উপর মুখোমুখি। নীচের তলার একজন হাসিমুখ আধাবয়সী সুন্দরপানা মেয়ে বলল, 'কাজের লোকজন সঙ্গে আনবেন, মাসিমা, এখানকার লোক রাখা যায় না।'

আমি অবাক হলাম, 'তবে যে কে বলল গাঁ আছে কাছে, মাঝে মাঝে শাক বেচতে আসে গাঁয়ের মেয়েরা।'

'তা আসে বটে। তবে বোধহয় ইন্সপেক্শন করতে এসেছিল। ওনারা শুনেছি সদুপায়ে টাকা রোজগার করাকে ঘেন্না করেন। ভালো কথা বলছি মাসিমা, নিজের লোক নিয়ে আসবেন। নয়তো আখেরে পস্তাবেন। তাতেও খুব নিশ্চিন্দি হতে পারবেন কি না সন্দেহ। দেখবেন হয়তো নতুন বন্ধুদের যাদের সঙ্গে সব চাইতে বেশি ভাব, তারাই সবার আগে দুনো মাইনে দিয়ে আপনার শিখিত-পড়িত দাসীটিকে ভাগিয়ে নিয়েছে।'

হাসি পেল। নিক্ তো কেউ আমার আমোদিনীকে ভাঙিয়ে। সাত দিনের মধ্যে যদি আবার পৌঁছে দিয়ে না যায় তো কি বলেছি। আমোদিনীর সব ভালো। আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কাউকে সইতে পারে না। গত ৪০ বছরে আমাদের বাড়ি থেকেই যা দুই কাজের লোকের হাড় জ্বালিয়ে, বাড়ি ছাড়া করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। রাঁধে চমৎকার, যে কোনও বাবুর্চিকে হার মানায়; কাপড় কাচে লন্ড্রির চাইতে সাফ কোরে আর কাঁথা সেলাই যা করে, শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধিকর্তারা টের পেলেই আমার হয়ে গেল! এখন বুড়ির নড়াচড়া করা কষ্টকর; কিছুতেই মানবে না ওকে বাতে ধরেছে। বলে, 'ও আমার ছেলেবেলা থেকে

আছে, ওকে বলে গুপো!' তা পায়ে গুপো হলেও হাতে তো আর হয়নি। আমাদের উড্ স্ট্রীটের বাড়ির দখনে বারান্দার নিচু তক্তাপোষে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে, বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের গায়ে দেবার জন্য একটি করে আগাগোড়া জামদানি কাজের মতো কাঁথা সেলাইয়ের নক্সা তোলে। আগে ছেঁড়া কাপড় আর পাড়ের সুতো দিয়ে করত; খুব বেশি দিন টিকত না। এখন আমি কাপড় আর এমব্রয়ডারি সুতো কিনে দিই, ও নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে, নিখুঁৎ ফোঁড় তুলে কাজ সারে। আমি আমার কাজ করে যাই, ও গুণগুণ করে কি যে বকে যায়, কানও দিই না। একটিও যে ভালো কথা নয়, সব যে শুধু নিন্দামান্দা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঝর্ণার মতো অনর্গল কলকল ছলছল করে বকে চলে, আমার কানে শুধু তার গুণ্‌গুণুনিটাই পৌঁছয়। অমন সুন্দর জিনিস যার হাতে তৈরি হয়, তার মুখ দিয়ে কেন অমন তেতো কথা বেরোয় তাও আমি জানি।

কি পেয়েছিল ও জীবনে? চোদ্দ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের মদো মাতাল তেজবরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তার কাছে কি পেয়েছিল? না কথায় কথায় বেদম প্রহার আর একটা খিটখিটে মেয়ে আর একটা ত্যাঁদড় ছেলে। সে দুটোকে মিশন স্কুলে জমা দিয়ে, নিজেও যৎসামান্য মাইনেতে মিশন বোর্ডিং-এর রান্নাঘরের বাসন ধোয়ার কাজ করত আর মিশনারি মেমদের জন্য যা যা রান্না হতো, সব শিখে নিত। আর হস্টেলের বড়দিদির কাছে এমব্রয়ডারি শিখত আর তার বদলে রোজ রাতে তাঁর পা টিপে দিত। সুখের বিষয়, ওর উপর দয়া করেই বোধহয়, প্রভু যীশু একদিন বুড়োটাকে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর থেকেই নাকি আমোদিনীর নিজের ভাষায় ওর জীবনটা সার্থক হয়ে উঠেছিল। অতি ভদ্র এক গোয়ানিজ বাবুর্চি ওর মেয়েকে বিয়ে করেছিল এবং ত্যাঁদড় ছেলেটাকে রাঁধাবাড়া শিখিয়ে শিমলায় তার নিজের হোটেলে চাকরি দিয়েছিল আর আমোদিনীকে

আমার শাশুড়ির অসুখের সময় তাঁর নার্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট রূপে এ বাড়িতে ভিড়িয়ে দিয়ে গেছিল। সেই অবধি সে এ বাড়িতে থেকে গেছে এবং আমাদের সল্ট লেকে যাওয়া স্থির হয়ে অবধি গুপো পা নিয়ে ছুটোছুটি গোছগাছ করছে।

ধক্ করে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটে উঠল। সেই রাজবংশীরাই কি তবে ঘরছাড়া হয়ে এখন যারা ঐ নতুন গ্রামে বসতি করছে, যাদের মধ্যে একজনও সৎ লোক নেই বলে শুনলাম? ওরা নাকি চুরিচামারিকে অন্যায় বলে মনে করা দূরে থাকুক, ধর্মের মতো পালন করে। আপিসে কাছারিতে লোকের বাড়িতে হুকুম পালা চাকরিকে ঘৃণা করে। এরাই কি তারা? চাকর বনে যায় না; জাত-ব্যবসার খাতিরে চাকরের ছদ্মবেশ পরে থাকে; তাতে কোনও দোষ হয় না। মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। তাই বলে ওদের আমি কখনওই রাখব না। আমারও জাতব্যবসা হল গেরস্তর সামগ্রী রক্ষা করা।

উড্ স্ট্রীটের বাড়িতে এ-ঘর ও-ঘর করি। কোন সম্পর্কটা রক্ষা করা যায় ভাবি। আসলটাকে তো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। স্থাবর যা কিছু তা তো রোজই বাক্স বন্দী হয়ে, ট্রাকে চেপে, মালিকদের হেপাজতে এখানে ওখানে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যা অস্থাবর, সে সব? যেমন এক তলায় আমার শ্বশুরমশায়ের পড়ার ঘরের দরজা বরাবর হল-ঘর; তার দরজা বরাবর পাশাপাশি দুটি দরজা; একটা খাবার ঘরের আর একটা তার পাশের ছোট ঘরের। সেই ছোট ঘরের দরজায় একটা নিচু টুলে আব্বাস বলে শ্বশুরমশায়ের চাপরাশি বসে থাকত; চোখ দুটি পড়ার ঘরের ডেস্কে বসা বাবার ওপর নিবদ্ধ থাকত। তিনি একবার তাকালেই সে যাকে বলে এক পায়ে খাড়া। মুনিব কোর্ট ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ধরলেও আব্বাসের টুলের নড়চড় নেই। তবে এখন আর তার সায়েবের সঙ্গে কোর্টে যেতে হয় না, পড়ার ঘর আর হল-ঘর দুটোর ওপর চোখ রাখতে হয়। বিশ্বাস

করো আর নাই করো; ঐ জায়গায় চিনে মাটির রঙিন বাসনের কুচি-বসানো মেঝের ওপর আব্বাসের টুলের চারটি পায়ার চারটি দাগ আজ অবধি লেগে রয়েছে। সে তো আর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

বাবার থেকে বেশ খানিকটা বড়ই ছিল আব্বাস, প্রায় নিরক্ষর; বাবা তাকে ইংরিজি লিখতে পড়তে, হিসাব কষতে, ভদ্রলোকরা, যেমন বাংলা বলে তাও বলতে শিখিয়ে, চাপরাশির কাজ করিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর হয়তো ৪৫ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আব্বাসের চেহারা এতটুকু টস্কায়নি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বিশেষ দরকারি কারণে হাঁকডাক করেও বাবা আব্বাসের সাড়া পান না। বিরক্ত হয়ে চোখ তুলে দেখেন সে দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে আছে! রেগে মেগে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও সাড়া দিল না। বাবার বুকটা ধড়াস করে উঠল। তার কাঁধে আস্তে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'শরীর খারাপ লাগছে আব্বাস?' আব্বাস এই প্রথম কোনও সাড়া না দিয়ে ঝুপ করে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। মনে আছে বাবার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। এ বাড়ির গুদোমে তার সামান্য জিনিসপত্রের মধ্যে তার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যায়নি। মনে হয় হয়তো পালিয়ে এসেছিল, আর যায়নি। বাবা তাঁর এক মুসলিম বন্ধুর কাছে মসজিদের খোঁজখবর নিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মাইনের বাড়তি টাকা সে বাবার কাছেই রাখত। তার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে বাবা এখানকার মুসলিম অনাথ আশ্রমের জন্য দান করেছিলেন। এসব কথা তো আর নতুন মালিকরা কিনে নিতে পারবে না। সব আমি নিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া সেই ডাইরিটা।

ঐ রকম ছিলেন শ্বশুরমশাই। শাশুড়ি বেজায় মেমসায়েব ছিলেন। তাঁর পোষাক আশাক দেখার একজন আধামেম ছিল। তার নাম এমিলি। গোয়ার রোমান ক্যাথলিক। সে আমাদের বলত, 'আট দশটা হাতওয়ালা কদাকার মাটির পুতুল গড়ে তার পুজো করার

কোনও মানে হয়? আবার তার পরে দাও সব জলে ডুবিয়ে। কেবল পয়সা নষ্ট। তার চাইতে সুন্দরী মেরি মায়ের পুজো করলেই পারো। এমন রূপ, এত দয়া কোথায় পাবে? সরল মনে যা চাইবে, তাই দান করেন।' ঐ আমোদিনী ওর ওপর হাড়ে চটা ছিল। বলত, ওদের রোমান ক্যাথলিক গির্জায় গিয়ে দেখে এসেছি, হিঁদুরাও ওদের চাইতে ভালো। কপালে কোন বিদেশের নদীর জলের ফোঁটা কেটে ভাবে সব পাপ ধুয়ে গেল। তার চেয়ে গঙ্গায় ডুব দিলেই হয়। হ্যাঁঃ ওরা আবার যীশুর সন্তান।' দুজনা দুজনকে দেখতে পারত না। অথচ আমোদিনীর হ্যাংলা ছেলেটাকে ডেকে ডেকে এটা ওটা কত কি খাওয়াতে দেখেছি, এমিলিকে। মানুষের মন বোঝা দায়। আমার শাশুড়ি সঙ্গে গেলে আর থাকেনি এমিলি। বলেছিল,'একজন অসহায় মানুষের সেবা করতে না পারলে আমার জীবন বৃথা।' ও চলে যাবে ভাবিনি। বলেছিলাম, 'গোয়া ফিরে যাচ্ছ, সেখানে অসহায় বুড়ো মানুষ কোথায় পাবে?'

এমিলি হেসেছিল, 'কেন আমার শ্বশুর ৮০ বছর বয়স, বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু। যীশু, আমার কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার কি ভাবনা।' আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম, 'তুমি না তার অত্যাচারেই জর্জরিত হয়ে এখানে সিস্টারদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলে? আবার সেখানেই ফিরে যাচ্ছ, কি আশ্চর্য!'

এমিলি ইংরিজিতে বলেছিল, 'আশ্চর্য কেন? বাইবেলে আছে না, যীশুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আমার ভাই যদি বারে বারে আমার ওপর অন্যায় করে, তাকে কতবার ক্ষমা করতে হবে?' যীশু বললেন, 'একবার ছেড়ে সাতবার ক্ষমা করবে, সাতশো গুণ সাতবার ক্ষমা করবে, যতবার সে তোমার উপর অন্যায় করবে, ততবার ক্ষমা করবে, একেবার শেষ তিক্তময় দিন পর্যন্ত।'

তারপর নিজের সামান্য যা ছিল গুছোতে গুছোতে বলেছিল, 'সৎমার মেয়ে জামাই সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে।

আমার যা আছে আর বাবার পুরনো বাড়িটার অর্ধেকটা ভাড়া দেওয়া আছে এক ডাক্তারকে; বাকিটাতে আমাদের দিব্যি চলে যাবে। সে আমার চাইতে ২০ বছরের বড়, আমি না দেখলে, কে দেখবে?' এই বলে আমার গালে কিস খেয়ে সকলকে গুড্‌বাই বলে চলে গেছিল আমাদের অর্ধ শিক্ষিত এমিলি। সে-ও আজ কত বছর হয়ে গেল। শুনেছি একটা ছোট কথা উচ্চারণ করলেও বাতাসে ঢেউ তোলে, সে ঢেউ অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। অনেক সময় এও মনে হয়, যেখানে যে ঘটনা ঘটে সেখানে তার ছাপ পড়ে যায়। এমিলি বলত তেমন তেমন অবস্থা হলে সেই জায়গায় আবার সে সব ঘটনার ছায়া দেখা যায় আর লোকে ভূত দেখেছে বলে ভয় পায়। ভূতটুত নয়, শুধু ছায়া। ঘরের ছাদে, দেওয়ালে, মেঝেতে মানুষের মন ছায়া রেখে যায়। আমি নিজে একা একা কতবার এ বাড়ির একতলার দোতলার সব ঘরে দুপুর রাতে ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনও কিছু দেখিনি, খালি শত শত শোনা কথায়, দেখা কথায় কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

আমার বিরাশী বছর বয়স, সিঁড়ি ওঠা-নামা করতে কষ্ট হয়; তবু সব ঘরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। আমাদের এ বাড়ি ভেঙে ফেলুক আর যাই করুক, এর একটা ইঁটও কেউ আমার মন থেকে নড়াতে পারবে না। ছোটবেলায় এখানে বাবার সঙ্গে কতবার এসেছি। বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার আর শ্বশুরমশাই জজসায়েব। বাবাই যথেষ্ট সায়েব আর শ্বশুরমশাই আরেক কাটি বাড়া। এখন ভাবলে হাসি পায়। দুজনে টেনিস খেলতেন, শাদা টেনিস সার্ট ফ্ল্যানেলের পেন্টেলুন পরে, শাদা জুতো পায়ে দিয়ে। আমার চোখে দুজনকেই সমান সুন্দর দেখাত। আমরা সবুজ ঢেউ খেলানো সীটের গার্ডেন বেঞ্চিতে বসে খেলা দেখতাম। আমার ভবিষ্যৎ শাশুড়ির মাথায় লম্বা হাতল খুদে রেশমি রোদের ছাতা থাকত। তাকে প্যারাসল বলত, মুখের ওপর একটা সুন্দর নেটের ভেল ঝুলত।

নইলে নাকি রোদের দিকে তাকালে ভুরু কোঁচকাতে হয়, আর কপালে ভাঁজের দাগ পড়ে। আমার জ্যাঠতুতো দিদিরা তাই নিয়ে বাড়ি ফিরে খুব হাসাহাসি করত। বলত, 'জানিস, বিলেতে যারা অনেকদিন থাকে, তারা সব মেম বনে যায়। মনেও কেমন মেমি ভাব জন্মায় জানিস না।' কানের কাছে আমোদিনী বলল, 'অতই যদি মন খারাপ করে তো বিক্রি করাতে মত দিলে কেন? তোমারই তো ডবল শেয়ার; তোমার ছোট দেওর দানপত্তর করে তার অংশ তোমায় দিয়ে গেছিল মনে নেই?'

বলেছিলাম, 'না রে, মন খারাপটা বাড়ির জন্য নয়। যে সব দিন চলে গেছে, যাদের নিয়ে গেছে, তার কথা মনে হচ্ছিল। কষ্ট নয়'। 'কষ্ট নয় তো চোখে জল কেন? মজা লাগলে কেউ কাঁদে? মরে গেছে, পুড়িয়ে ফেলেছে, ব্যস্ চুকে গেছে। মাগো, কি বজ্জাৎ ছিল, তোমাদের ঐ ছোটবাবুটি।তার জন্য কেউ কাঁদে? তার বাপ তাকে দূর করে দিয়েছিল। মা তাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিত। অমন লক্ষ্মীমতি বৌটা সে পর্যন্ত তিষ্টুতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে গেল। রাজার মেয়ে সে, এত হেনস্তা সইবে কেন। দিব্যি সুন্দর বিলেত চলে গিয়ে শুনি নাকি সায়েব বিয়ে করে রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতে সুখে থাকে। তবে ছেলেপুলে হয়নি। ঐ যে তিন বাঁকা ছেলেটা জন্মেই মরেছিল, সেই সময়ই কিছু ঘটে থাকবে। মেয়েমানুষের শরীল তো, বড় বালাই ওর, তাছাড়া—

এতক্ষণ বাদে সম্বিৎ ফিরে আসতে বললাম, 'হ্যাঁরে, আমোদিনী, এত কথা তুই—ই বা জানলি কি করে?' বেজায় চটে গেল সে, 'কেন, মুখ্খু বলে কিছু জানতে নেই? বসে তো থাকিনি কখনও। সারাজীবন খেটে খেয়েছি। তবু কারও মন পাইনি মা।' এই বলে কেঁদেকেটে এমন কাণ্ড বাধাল যে আমার ঘরদোরের সঙ্গে কথা বন্ধ করে ওর সঙ্গে ওপরে চলে আসতে হল। বললাম 'ওরে, সব রোগের যে পরম ওষুধ সে তো তোর জানাই আছে। কাজের মতো

কিছু আছে কি? আর তোর কাজের হাতের তুলনা নেই।' আমোদিনী আমার পায়ে পড়ে বলল, 'কিছু বলনি মা, কাউকে সন্দ করা তোমার স্বভাবও নয়। যখন যা চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেছ। তবু বড়ই আতান্তরে পড়ে গত বছর তোমার হিসাব খাতার মধ্যিখান থেকে সেই একশো টাকার নোটটা আমিই নিছলাম, মাগো। তুমি কাউকে কিছু বলনি, কিন্তু আঁতি-পাঁতি খুঁজেছিলে। সেই সময়ে তোমার ব্যাংক-ফেলেও অতগুলো টাকার ক্ষতি হয়ে গেছিল। সব জানতাম, তবু নিছলাম! তুমি নিশ্চয় বুঝেছিলে, তাই কিছু বলনি।' এ তো মহাজ্বালা!

আমোদিনীকে টেনে তোলা আমার সাধ্যি নয়। অগত্যা সে নিজেই উঠে পড়ে বলল, 'তাই যীশু আমার হয়ে তোমাকে অতগুলো টাকা পাইয়ে দিলেন। তবু তোমরা গির্জে যাও না।'

ওর সঙ্গে আমি দোতলায় চলে এলাম। সত্যি বড় ভালো হাতের কাজ ওর। বুড়ো বাবুর্চি তার বাতে পঙ্গু শরীর নিয়ে আর পারছে না। সে দেশে ফিরে যাবে আমোদিনী বলছে সে-ই নাকি আমাদের দুটো নতুন ফ্ল্যাটের একটার রান্নাঘরে ক্যান্টিন খুলবে। তার জন্য ভাড়া দেবে না বটে, কিন্তু রিবেটে সবাইকে খাওয়াবে। বলা যায় না, ভারী কাজের মেয়ে ও। প্রতিদ্বন্দ্বী বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু ওর ১২ বছরের নাতিকে যদি হেল্পার পায় তবে ওর কোনও অসুবিধে হবে না। হয়তো সত্যিই তাই।

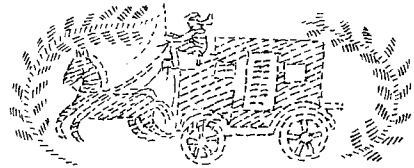

দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি। তার মানে ১৮৪০ কিম্বা তারও ২/১ বছর আগে। মহারানি ভিক্টোরিয়ার যুগে। তখন এটা ছিল খাস বড়-সায়েবদের পাড়া। তার মধ্যে ২/১ জনা দিশী বড়-সায়েবও ছিলেন। কারও সঙ্গে মাখামাখি দূরে থাকুক, চেনাজানাও ছিল না। আমার শাশুড়ির কাছে শুনেছিলাম এ-সব সায়েবরা ভারী ভদ্র ছিল। আচমকা দেখা হলে টুপি খুলে গুড মর্ণিং কি গুড ইভনিং বলত। ফিটফাট কায়দাদুরস্ত। আমাদের মতো ল্যাদাড়ে ছিল না। পথে একটা কুটো পড়তে পেত না। মেমদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ইভনিং ওয়াকে বেরুত। স্বামীর হাতের কনুই ধরে মেমরা হাঁটত। সকালে মাথায় ফুল-বাগান টুপি থাকত। কখনও বা লম্বা লম্বা পাখির পালক চোখের ওপর ঝুলে পড়ত। রোজ সকালে হোজ পাইপের জল দিয়ে পথ ধোয়া হতো, ঝাড়ু হতো দু বেলা। তার ওপর দিয়ে কোমর আঁটো লম্বা গাউনের স্কার্ট এক হাতে তুলে খুট্-খুট্ করে তারা হেঁটে যেত। শ্বশুর-মশাই গিন্নিকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে ছিলেন, কিন্তু ঐ-টি পারেননি। তিন ইঞ্চি উঁচু গোড়ালির জুতো দেখলেই গিন্নির ফিট হবার জোগাড়! তখনকার এইসব আধাসায়েবরা ছিলেন বড়-সায়েবদের ডান হাত আর দেশ-প্রেমিকদের অবলম্বন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশরা গুণের আদর জানত আর গুণী লোককে পেলেই তাকে কাজে লাগাতে চাইত। অবশ্য এমনভাবে যাতে ব্রিটিশ স্বার্থের ক্ষতি না হয়। শ্বশুরমশাই বলতেন

ওরাই আমাদের দেশপ্রেম শিখিয়েছে। তার আগে হয়তো রাজভক্তি ছিল, দেশপ্রেমের কোনও ধারণাই গড়ে উঠতে পারেনি। রাজার এবং ধর্মের জন্য তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু রাজ্যকে তখনকার অল্প শিক্ষিত লোকে আলাদা করে দেখতে শেখেনি। একজন ইংরেজ মনীষী বলেছিলেন, 'এরা ধর্মের জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়, কিন্তু কে ট্যাক্স সংগ্রহ করে না করে তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই পুব দিকের দেশগুলো জয় করা এত সহজ। এরা এক অদৃশ্য জগতের প্রজা।' অর্থাৎ ধর্মে হস্তক্ষেপ কোরো না, তাহলেই নিজেদের ইষ্ট সাধন করতে পারবে।

এ-সব কথা শ্বশুরমশাই প্রায়ই বলতেন। কখনও মিথ্যা কথা মুখে আনতেন না। একবার যা বলতেন তার কখনও নড়চড় হতো না। স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে নিখুঁৎ ইংরিজিতে বিলিতি কাগজে লিখতেন। তবে এ-ও বিশ্বাস করতেন যে পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলেন গৃহস্বামী। বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা স্ত্রীরাও তাঁকে তাঁর যোগ্য আসন ছেড়ে দিয়ে, দেখতে দেখতে ঘর-গেরস্থালির সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে দাঁড়াতেন। অবশ্য স্বামীর অপছন্দে কোনও কিছুকে বাড়িতে বা জীবনে ঠাঁই দিতেন না। অতি হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন শ্বশুরমশাই, তবে নারীকে পুরুষের সমান করে দেখবার কোনও কারণ খুঁজে পাননি। উড় স্ট্রীটের সায়েবদের সঙ্গে কোনও বিরোধ ছিল না তাঁর। কোনও অন্তরঙ্গতাও ছিল না।

একবার সকালে দেখলাম সামনের বাড়ির সব জানলার পরদা টানা। এমিলি বলল, 'তার মানে বুড়ো মিঃ কিং-এর স্ত্রী এতদিন পরে স্বর্গে গেলেন। আর দশ বছর আগে গেলে পারতেন। মামসেলকে বিয়ে করে বুড়োর শেষ বয়সটা আরামে কাটত। গডের বিধান বোঝা দায়?

শাশুড়ি কাষ্ঠ হেসে বলেছিলেন, 'তা তেমন শুনি ভগবান তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।' এমিলি সাধারণতঃ তর্ক

করত না। সেদিন হঠাৎ বলল, 'তাতে কোনও দোষ হয়েছে কি? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রীকে পাছে ইংল্যান্ডে ওঁর আত্মীয়স্বজনরা ভালো চোখে না দেখে তাই অবসর নিয়েও এ-দেশে থেকে গেলেন। একটা ছেলে, সে-ও অস্ট্রেলিয়া চলে গেল। সাত পুরুষের ফিরিঙ্গি স্ত্রী তাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিল না। কিন্তু কি সেবাটাই না করলেন।'

এই সময়ে কালো ঘোড়ায় টানা কাচের গাড়িটা আর তার পিছন পিছন দু-তিনটে বড় বড় ল্যান্ডো গাড়ি পাশের বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াতে এ বাড়ির কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। এমিলিও উঠে গেল।

ভাবলাম, কি আশ্চর্য! সামনের বাড়িতে মানুষটা মরে গেল আর আমাদের এতটুকু জানান দিল না! হয়তো ত্রিশ বছরের প্রতিবেশী। শাশুড়ি অপ্রত্যাশিতভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি জানি! খানিকটা প্রাণ খুলে হাউমাউ করলেও তো মনটা হালকা হতো।' মনে মনের ভাব চেপে রাখাই কি সভ্যতার উচ্চস্তরের লক্ষণ? হঠাৎ স্মরণ হল ছোটবেলায় ছোট ভাইটার জলবসন্ত হয়েছিল। সকলের পরীক্ষা আসন্ন। রুগীকে আলাদা ঘরে রাখা হল। তাই দেখে আমাদের ছোকরা কাজের ছেলে পরম বলল, 'কি পিচাশ গো দিদি তোমরা। রুগী মানুষটাকে একলা করে দিতে পারলে?' আমরা বললাম, 'কেন, তোরা কি করিস?'

সে বলল, 'কি আবার করার আছে? বাড়িসুদ্ধু সব ছেলেপুলে বুড়োবুড়ি রুগীকে ঘিরে বসে বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকি! যদি ভগবানের দয়া হয়।' আমাদের খুব হাসি পেত, 'তাই হয় নাকি?' পরমও হাসত, 'ভগবান কি আমাদের চাকর যে আমাদের কথা মতো চলবে? রুগী মরে না সবসময়; কিন্তু তার বদলে আমাদের সকলের ঐ ব্যামো হয়।'

এ সব হল গিয়ে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধ

শেষ হয়ে গেছে; দ্বিতীয়টার কথা লোকে তখনও ভাবতে শুরু করেনি। তখনও সকলে পৃথিবীর সুবর্ণ যুগের কথা ভাবছে। ঐ প্রথম মহাযুদ্ধটা নাকি পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ, যার সাহায্যে ভবিষ্যতের সব যুদ্ধের অবসান ঘটানো হল। তবে ফের যদি কোনও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষীর মাথা চাড়া দেবার আস্পর্ধা হয়, তাকে এর চাইতেও সাংঘাতিক রকম শিক্ষা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সকলে যেন অবহিত থাকে। পাছে সেই দুর্বুদ্ধি কারও হয়, তাই পশ্চিম জগতের সকলে গোপনে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের পরিকল্পনা করতে লাগল। ভুলে গেলে চলবে না যে অধুনা বিখ্যাত নোবেল শান্তি পুরস্কারের দাতার আবিষ্কারের কারণেই হিরোশিমা—ওকিনাওয়ার সর্বনাশ সম্ভব হয়েছিল। এ-সব আমার বাপের বাড়ির খাবার টেবিলে নিত্য আলোচ্য ব্যাপার ছিল। তবে সে-সব অনেকদিন পরের কথা। আমি যখন ১৯২৮ সালে উড্ স্ট্রীটের এই বাড়িতে বধূ বেশে পা দিলাম, তখনও ঐ সমস্ত ঘটনা ভবিষ্যতের গর্ভে। তখনও ব্রিটিশরা এ দেশে বেশ কায়েমী হয়ে বসে আছে। অনেক দূরে যে ছুটির ঘন্টা বাজছে, তার শব্দ তখনও কারও কানে পৌঁছয়নি। মনে আছে খাদি নিয়ে, স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে বিলিতি কাগজরা মস্করা করত। কিন্তু গান্ধীজিকে আর লবণ আন্দোলনকারীদের ধরে নিয়ে জেলে পুরতে, এমন কি অনেক লোককে আন্দামানে চালান করতে ছাড়ত না। এর ফলেই যে দেশের তরুণ দল পায়ে জোর পাচ্ছে সেটা কেউ কেন খেয়াল করছে না, ভেবে পেতাম না। আমার মনে আছে আমার বাবার আপিসের যে স্থানীয় চীফ্ হবে সে যখন কাঁচাকাঁচা অক্সফোর্ড থেকে পাস করে এদেশে এল, তখন তার ২৪ বছর বয়স, কোথাও কোনও কাজের অভিজ্ঞতা নেই। বাবা তাকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে এক বছরে কতকটা চৌকোস করে দিলেন। তারপর সে বাবার ওপরওয়ালা হয়ে বসল! তবে শুনেছি এরা ভালো ঘরের ছেলে, শিক্ষিত এবং সাধারণত অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করত। বাবা কোনও

কালেও সাহেবিয়ানা করতেন না। ঘোড়ায় চড়তেন, ক্রিকেট খেলতেন, চমৎকার ইংরিজি বলতেন, দক্ষ কর্মী ছিলেন। কিন্তু আপিস থেকে বাড়ি এসেই পাজামা আর চটি পরে বেড়াতেন, খাবার পর পান খেতেন, মদ্য ছুঁতেন না আর অহরহ বলতেন, 'যদি বিপক্ষ দলের সঙ্গে লড়তে হয়, সর্বদা শত্রুর দোষ দুর্বলতার চাইতেও গুণগুলোকে চিনতে হয়। চমৎকার ব্রিজ খেলতেন বাবা, ইংরিজি বাংলা দুই-ই ভালো লিখতেন। অজস্র গুণ ছিল তাঁর, তবে একটা বিষয়ে আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে মিল ছিল। দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে মেয়েদের দুটো পাজরাই কম নয় মগজের ওজনও কম। অতএব বাড়ির কর্তার ইচ্ছায় সব কর্ম হতে হবে। এ-সব হল গিয়ে অনেক দিন পরের কথা। আমার এ গল্প শুরু হচ্ছে ধরো ১৮৬০ সালে। তখনও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মাননি; মাইকেল বেঁচে; রবীন্দ্রনাথ হয়তো মাতৃগর্ভে। তখন রামমোহন স্বাধীন হবার প্রথম মন্ত্র দেশের লোকের কানে তুলে দিয়ে চলে গেছেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম স্বাধীনতার সাধনা করেছেন, রাজনীতি করে নয়, সমাজনীতি দিয়ে।

এখনকার দুনিয়াকে দেখি আর ভাবি গাছ বিচার করতে হলে তার শিকড়ের কথাও ভাবতে হয়। শুধু ফুল ফল দিয়ে হয় না। আমাদের উড্ স্ট্রীটের বাড়িতে ১৫০ বছর কাটলেও, ওখানে তার মূল নয়। আমাদের চিন্তাধারায় ওপরেও যতই বিলিতি পালিশ পড়ুক, মূল তার অন্য জায়গায়। নাকি তাদের মাতৃপ্রধান যাযাবর সমাজ ছিল! সমাজ আবার কি? বংশ বলাই ভাল। আমাদের উড্ স্ট্রীটের বাড়িও মাতৃপ্রধান ছিল। এখানে এককালে রাজত্ব করতেন জয়ন্তী। তাঁর অমন নাম বদলে এঁরা করে দিয়েছিলেন মধুরিমা! ওঁর স্বামী নাকি রিমা বলে ডাকতেন। আর ওঁর শ্বশুর-শাশুড়ি একবারের জন্যেও এখানে রাত্রিবাস বা অন্নগ্রহণ করেননি। বেজায় গোঁড়া বংশ ছিল ওঁদের। নাকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সায়েবদের সঙ্গে কারবার

করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিলেন। বড়বাজারে মস্ত মালগুদোম ছিল। শ্যামবাজারে তিন তলা বসত বাড়ি, তার লাগোয়া সুন্দর নারায়ণের মন্দির ছিল। নবরত্নের উপর তৈরি। দেবোত্তর জমি। এখনও আছে। অন্য শরিকের ভাগে পড়েছে। আইনটাইন ভালো বুঝি না। বাড়িটা নাকি কেনা জমির ওপর। সেটা ঐ শরিকরা অনেক দিন আগেই নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল। জয়ন্তীর শ্বশুর-শাশুড়ি সেই আদি বাড়িতে থাকতেন। শাশুড়ি ছিলেন ওঁর মায়ের সই। বাপ শ্বশুরের গুরুভাই। ঐ সুন্দর-নারায়ণের মূর্তি বড় সুন্দর। আমিও দেখেছি। সোজা হয়ে দাঁড়ানো, মনে হয় অষ্ট ধাতুর তৈরি। নাকি বেজায় ভারী। নাকি স্বপ্নলব্ধ। কোনও পূর্ব-পুরুষ স্বপ্ন দেখে কাশীর কোনও বটতলা থেকে খুঁড়ে তুলে, নামাবলী দিয়ে বুকে বেঁধে, একবারো সেটিকে ভুঁই ছোঁয়াতে না দিয়ে, এমনকি রাতে নিজের দুপাশে কাঁটা গাছ স্তূপ করে রেখে—যাতে ঘুমের ঘোরে এপাশ-ওপাশ না হয়ে যায়—ছয় মাসে কলকাতার মাটিতে (অর্থাৎ কোনও গাঁয়ে) এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা বাহুল্য তখন কলকাতা বলে কিছু ছিল না। জব চার্ণক জন্মায়নি পর্যন্ত। ততদিনে পরিবারের মানুষরা খুদে মন্দির তৈরি করে, ওঁর আশা প্রায়, ছেড়েই দিয়ে বসেছিল। সেই দিন থেকে উত্তরোত্তর এই বংশের উন্নতি সাধন হতে হতে, বড়লোকত্ব লাভ করে; পরে সায়েব-ও বনে গেল। এ-সব আজ কত কালের কথা। কিংবদন্তীর মতো শোনায় আর তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার যে অনেক পরিবারের বিষয়ে এই একই ধরনের কথা শোনা যায়।'

তবে একটা বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সেটি হল যে নকল সায়েব হওয়ার পিছনে দেশের প্রতি ঘৃণা ছিল না, বরং এত প্রেম ছিল যে এ দেশটা কেন সব থাকতেও সায়েবদের মতো দেশসেবক হয়ে উঠছে না, এ কথা ভাবলেও ওঁদের গা জ্বলে যেত। এত কর্মবিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ মনা যে মনগুলোর

খোল-নলচে বদলানো দরকার বলে মনে করতেন। এত কুঁড়েমি, এত নোংরামি, এত গোঁড়ামি, এর কোনও ওষুধ নেই। একেবারে উপড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এইরকম আমার সন্দেহ হয়।

বাড়ির ফটকের বাহারে থাম্বার ডান দিকেরটাতে একটা শ্বেত পাথরের ছোট ফলকে লেখা : চৌধুরী হাউস। অন্য দিকে ঐ একই রকম ছোট ফলকে লেখা আর চৌধুরী। ফলাও করে নাম জাহির করত না সায়েবরা সেকালে। শাদা, কালো, ব্রাউন, ছাই, গাঢ় নীল ছাড়া বড় একটা রংচং পরত না। তবে হাতে বোনা স্কটিশ সোয়েটারের কথা আলাদা। ওরা কাজ দিয়ে নাম কিনত। এ-কথা আমার শ্বশুরমশাইকে, আমার বাবাকে অনেকবার বলতে শুনেছি। পুজোটুজো হতো না এ বাড়িতে। কেউ বলত ব্রহ্মজ্ঞানী কেউ বা বলত খ্রিশ্চান। আর বেশির ভাগ বলত নাস্তিক। শ্বশুরমশাই হাসতেন। একটা নিয়ম ছিল, 'কোনও ধর্ম বিষয়ে অশ্রদ্ধা করে কথা বলবে না। কোনও দুঃখী লোককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না। তবে যাকে যা দেবার বড়বাবু দেবেন। বাড়ির মেয়ে-বৌরা দেখা দেবে না।' এদিকে নারী কল্যাণ সমিতির দলের সঙ্গে—অবিশ্যি গাড়ি চেপে—আমরা যখন গ্রামে যেতাম, তখন খালি একবার সাবধান করে দিতেন যেন জল পর্যন্ত মুখে না দিই। সায়েবরা যে অনেক বেশি অনুকরণীয় তাতে সন্দেহ নেই।

পয়লা বাড়ি ছাড়তে হবে। তার ক-দিন আগে, ছেলে এসে বলল, 'শুনলাম ওরা বুলডোজার দিয়ে গেট ভেঙে ফেলবে। তার আগে দু-পাশের ঐ ফলক দুটি খুলে নিতে চাই।' তাই হয়েছিল। নামের ফলকের পিছনে দেখা গেল ছোট একটি সোনার বাটিতে এক মুঠো ছাই। কিসের কে জানে। আর অন্য ফলকের পিছনে খুদে এক সোনার সুন্দর নারায়ণ। অবিকল বড় মূর্তিটির মতো। বলে নাকি নাস্তিক! যেন সায়েব হলেই নাস্তিক হতে হবে! আরে,

অনেকদিন আগে হরিদ্বারে গিয়ে একজন খাঁটি সায়েব হিন্দু দেখে এসেছিলাম। নাম বোধহয় নিকলসন। মুখখানি দেখলেই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে।

যদি সবাই মিলে ট্রাকের ওপর ভ্যানের ওপর যা কিছু সম্পদ-সম্পত্তি চাপিয়ে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম, তাহলে হয়তো দুঃখে বুক ফেটে যেত। গেলাম যখন, তার এক মাস আগের থেকে আমাদের জিনিসপত্র দফায় দফায় চালান হয়েছিল; বাড়ির অর্ধেক মানুষ ওখানে গুছিয়ে বসেছিল। ওখানকার রান্নাঘর বৌনি হয়েছিল। মনের নিবাস ছেড়ে নতুন জায়গার অচেনা বাসিন্দা হতে যাইনি। বলেছি তো মনের নিবাস কি আর ইঁট-কাঠ দিয়ে তৈরি হয়? সে দিব্যি সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। সেখানে পৌঁছে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠলাম, শান্তিনিকেতনী কাজ-করা ছোট একটা ব্রীফকেস নিয়ে। তার মধ্যে ছিল জয়ন্তীর আংটি আর ডাইরি আর আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি ছোট জিনিস।

গাড়ির শব্দ শুনে কোলাহল করতে করতে নাতি-নাতনিরা নেমে এসেছিল। বুক আমার ভরে গেছিল। মনে হয়েছিল নদী থেকে যদি কেউ এক ঘড়া জল তুলে বালির ওপর ফেলে দেয়, নদীর জল যেমনি ছিল তেমনি থাকে, এতটুকু টোল খায় না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় মুখোমুখি দুটো ফ্ল্যাট। তাদের সামনের দরজা হাট করে খোলা। চারদিক থেকে আলো হাওয়ায় সব ঘর ভরে ছিল। আমার মনের মধ্যে যদি এতটুকু গ্লানি থেকে থাকে তাও উড়ে গেল। মন পাখি ডানা মুড়ে বসল।

আর যাইনি উড় স্ট্রীটে। ঐ দিকটা তো নাকি আর চেনা যায় না। কলকাতাকে অনেকে বলে পুরনো শহর। এই বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। আমার চোখের সামনে একটু একটু করে পুরনো কলকাতা বিদায় নিচ্ছে। তার জায়গায় আধুনিক এক নতুন শহর জুড়ে বসছে। নতুনেতে পুরনোতে খাপ খাচ্ছে না। ভবানীপুর কালীঘাট আপনি

আপনি লোপ পাচ্ছে। এক কালে যেখানে সুন্দর সুন্দর নতুন বাড়ি উঠতে দেখেছি, সেখানে কেউ থাকতে চায় না। হয়তো পর পর ৫০/৬০টা ঝুরঝুরে দোকান পরস্পরের গায়ে গায়ে ঠেকো দিয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম আধুনিক জিনিস বিক্রি করছে। দেখে মনে হয় একটু জোরে নাড়া দিলেই ভেঙে পড়বে। তবু নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করে এরা। ঘটা করে পুজো করে; আলোয় আলোয় নোংরা দোকান ঝলমল করে। নতুনে পুরনোতে এমন সমাবেশ কোথায় পাব?

তবে আমাদের নোনাপানিতে সব কিছু ঝক্‌ঝকে নতুন। পরিষ্কার তক্‌তকে, পূর্ব-পরিকল্পিত। উদ্ভট অদ্ভুতের এতটুকু জায়গা বাকি থাকছে না, হায় হায়। অবিশ্যি উদ্ভট অদ্ভুত চিত্তহারী জিনিস কি আর বাইরের উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়? আমাদের বাড়িটা একটু ফাঁকায়, একটু আলাদা পাচিল দিয়ে ঘেরা। হয়তো নিরাপত্তা একটু কম। আমরা যেদিন এসে পৌঁছলাম, কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা মিশ্র জাতের কুকুর-ও আমাদের পিছন পিছন দোতলায় এসে উঠল। সাদা-কালো রং, হয়তো বছর দেড়-দুই বয়স; রোগা শরীরে অযত্নের ছাপ; নিতান্ত নেড়িও নয়; আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়ে আমার পায়ের ওপর মাথা রাখল।

আমার নাতি-নাতনিরা ভেবেছিল আমার বুঝি ঐ মস্ত বাগানওয়ালা বিশাল বাড়ি ছেড়ে এই চাঁচাছোলা ঝাড়াঝাপ্টা দুটি ফ্ল্যাটে এসে থাকতে বড্ড কষ্ট হবে। এত কালের এত স্মৃতি দিয়ে জড়ানো সেই বাড়ি! তা খানিকটা হবে বৈকি। পায়ের একটা আঙুলের নখের কোণাটা একটু বেশি করে কেটে ফেললে জ্বলে মরি আর ৬০ বছরের পুরনো আবাস থেকে নিজেকে শেকড়বাকড় সুদ্ধু উপড়ে আনলে কষ্ট হবে না? তাই কি সম্ভব? তবে কি না, ঐ ষাট বছরের স্মৃতি তো আর ঘরের দেওয়ালে আঁচড় কেটে লেখা ছিল না, সে তো আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে লেখা হয়ে আছে। আমার আমিত্বটাই যে তিলে তিলে ঐখানে গড়ে উঠেছিল। ও যে আমার সারা জীবনের সুখ দুঃখের সাক্ষী। কিন্তু তার বেশি নয়, যা নষ্ট হবার নয়, তাকে কি এক জায়গা থেকে তুলে অন্য জায়গায় বসাতে ইচ্ছা করে?

মোট কথা এখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম আমি একা আসিনি, কিছু ফেলেও আসিনি। সব সঙ্গে এসে ভিড় করে আছে। তার উপর এখনকার ঐ বে-ওয়ারিশ রোগা কুকুর যেই আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে, মুখের দিকে তাকাল, অমনি বুঝলাম এই তো আমি বাড়ি এসেছি। বললাম তো আমার মনের পাখিটা খানিক ডানা ঝাপটে তারপর ডানা মুড়ে বসল। নাতনিদের বললাম—ওকে দুধ রুটি খাওয়া। তারপর সোমা দিয়ারা মহা খুশি হয়ে কোত্থেকে গরম

জল এনে সাবান দিয়ে তাকে যখন স্নান করিয়ে, পুরনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিল। তার যেন আর তর সয় না, এক দৌড়ে আমার কাছে এসে সামনের পা দুটিকে আমার কোলে তুলে দিল!

ঠিক সেই সময় আমার ছেলে জয় ঘরে এসে ব্যাপার দেখে বলল, 'তোফা!' তাই শুনে কুকুরও জয়ের চারদিকে নেচে কুঁদে একাকার। জয় বলল, 'খুব একটা নেড়ি কুত্তোর মতো তো লাগছে না। বোধহয় ওর নাম ট্যাফি।' থেকে গেল তোফা আমাদের বাড়িতে। ইঞ্জেকশন হল, লাইসেন্স হল। কেউ ওর খোঁজ করতে এল না। সবাই ডাকে ট্যাফি। মনে পড়ল আমার, ছেলেবেলায় চেরাপুঞ্জিতে গিয়েছিলাম। সেখানে কেমন বাড়িতে থাকতাম, কি করতাম কিছু মনে নেই। বয়স ছিল তিন। কিন্তু নীলমণি দাদামশাইকে স্পষ্ট মনে আছে। মুখ ভরা পাকা দাড়ি গোঁপ, চোখে নীল চশমা, তার একটা ভাঙা ডাঁটি কালো সুতো দিয়ে বাঁধা। তাঁর একটা স্কুল ছিল আর একটা মস্ত সাদা আর পাটকিলে রঙের কুকুর ছিল; তার সারা গায়ে নরম নরম লম্বা লোম আর মস্ত ঝালরের মতো ল্যাজ। তার নাম ছিল ভজহরি। আমরা তাকে ভজু বলে ডাকলেই, ছুটতে ছুটতে আসত। নীলমণি দাদামশাই খুশি হয়ে বলতেন, 'খুব করে ডাক ভজহরি। তাহলে বেঁচে যাবি।' এত দিনে তার মানে বুঝি। অবিশ্যি ডাকলেই বেঁচে যাব, তা-ও মনে হয় না।

একজন বুড়ো মানুষ এল। একটা চিঠি দিয়ে বলল, 'অনিলদাদাবাবু দিলেন। বললেন আপনাদের হয়তো লোক দরকার হতে পারে। আমার নাতিটাকে যদি রাখেন।' অনিল চৌধুরীই আমাদের মৎস্য প্রকল্পের সেই আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তাহলে সে আছে এখনও। অনিল লিখেছে,

'দিদি,

এদের বাড়িতে মাছভাজা আর আম খেয়েছিলাম আমরা,

৫০ বছর আগে। সেদিন আর নেই। এদের ছেলেমেয়েদের সৎ পথে থাকা বড় শক্ত। যদি কিছু করতে পারেন।

স্নেহঋণী অনিল

ঐরকম চিঠিপত্র লিখতাম আমরা সেকালে। আমার এক বুড়ি পিসি চিঠিতে প্রায় সবাইকেই সম্বোধন লিখতেন 'প্রাণাধিকাসু' বলে। কিচ্ছু হাসি পেত না তাতে। আমাদের ছিল স্বচ্ছল শিক্ষিত গেরস্ত সংসার। অভাবও ছিল না, অতিশয় উচ্চাশাও ছিল না। অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রকাশ করতেন বড়রা। তার বদলে বাধ্যতা আশা করতেন। তাঁদের বদ্ধ ধারণা ছিল যে যাঁরা বয়সে বড়, তাঁদের কম লেখাপড়া জানা থাকলেও, সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বেশি, তাই তাঁদের মেনে চলা উচিত। মনে আছে আমরা তখনকার নব্যদের দলে ছিলাম, তাঁদের এ বিশ্বাস একটুও বরদাস্ত করতে পারতাম না। কেউ একটু অন্য পথে যেতে চাইলেই হয়ে গেল। অমনি যেখানে যত মাসি পিসি খুড়ি জ্যেঠি খুড়ো জ্যাঠা মামারা সবাই নিজেদের মধ্যে ভেদ ভুলে গিয়ে, দল বেঁধে এসে বিদ্রোহীকে সায়েস্তা করার চেষ্টা করতেন। আর তাঁদের ছেলে-মেয়েরা একবাক্যে অপরাধীকে সমর্থন করত! এখন ভাবলেও হাসি পায়। তখন রেগে চতুর্ভুজ হয়ে যেতাম। গত ২০ বছরের মধ্যে কারও ওপর বেশি রাগ করেছি বলে মনে হয় না। এখন আমি যা খুশি তাই করলেও কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করে না। কেন সেই বুড়ো বুড়িরা সংঘবদ্ধ হয়ে আমার সব কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা করে না ভেবে আমার বুক ফেটে যায়। তখন তো সব দরকার হলে লোকাল ট্রেনে এসে ছেঁকে ধরত। কোন স্বর্গে গিয়ে তাঁরা অশান্তি করছেন কে জানে। তাঁদের অভাবে আমার জীবনের অনেকখানি শূন্যময় হয়ে যেত, যদি না নাতি নাতনিরা তাঁদের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠত। আমি অনেক সময় রাতে জেগে এদের জব্দ করার উপায় ঠাওরাই। সুখের বিষয়, সকালের মধ্যে কিছুই মনে থাকে না। তার চাইতে অনেক ভালো

করে মনে পড়ে আমার বারো বছর বয়সের বেওয়ারিশ বেড়াল ছাবড়ার মুখটা।

সত্যি কথা বলতে কি, ছাবড়া এমন কিছু রূপবানও ছিল না; কেউ ওকে পছন্দও করত না। সারা দিন কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত, আজও তা ভেবে পাইনে। সম্ভবত আমাদের কোনও ঘরের মধ্যেই কোনও গোপন আনাচ-কানাচে। রাতে আমার খাটে উঠে আমার লেপের তলায় ঢুকে, পায়ের কাছে চুপ করে শুয়ে থাকত। সারা রাত আমার পা-দুটো গরম হয়ে থাকত। দেখতে ভালো না হলেও ওর গা-টা যে কি নরম-গরম ছিল সে আর কি বলব। সকালে উঠে তার চিহ্নটুকু দেখতে পেতাম না। ছাই রঙের একটা হুলো-বেড়াল। সবুজ রঙের চোখ। চোখের উপর কোনও শত্রুর সঙ্গে বিগত কোনও যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। ছাবড়াকে আমি বড়ই ভালোবাসতাম। আশা করি আমরা সেই শীতের দেশ ছেড়ে চলে আসার পরে অন্য কোথাও একটা আরামে রাত্রিবাসেরও জায়গা পেয়েছিল। ওকে আমি বড়ই ভালোবাসতাম বলে একবারও বলছি না ওর স্বভাবচরিত্র খুব ভালো ছিল। প্রথম কথা ও ১ নম্বরের চোর ছিল। উনুনে বসানো দুধের সর নখ দিয়ে আঁচড়ে খেয়ে ফেলত। সিকে থেকে লাফ দিয়ে মাছ নামিয়ে খেত, নষ্ট করত। ছাইগাদায় লুকিয়ে থাকত। রান্নাঘরের দোর খোলা পেলে ল্যাজ তুলে পালাত। মনে হতো ফ্যাচফ্যাচ করে হাসছে। এতটুকু অনুতাপের লক্ষণ নেই। তার উপর আমার কাছে যতই ভালোমানুষ সেজে থাকুক না কেন, ঝগড়াটের এক শেষ ছিল। দিনের বেলা হয়তো বাইরে কারও পাশ দিয়ে চলে গেল, তারা বড় জোর বলল, অ্যাই ভাগ্! ছাবড়া অমনি ফ্যাঁশ করে নাক দিয়ে একটা শব্দ করে, এই বড় বড় নখ বের করা একটা থাবা তুলে ভয় দেখিয়ে ল্যাজ উঠিয়ে পিট্টান দিত। ট্যাফি আসার পর দিন, ৭০ বছর পরে অবিকল সেই পুরনো চেহারা নিয়ে ছাবড়া আমার কাছে ফিরে এল। এর মধ্যে আমার জীবনে কত বুক

ভরে পাওয়া আবার বুক ভাঙা হারানো ঘটে গেছে, তার হিসাব কে রাখে! আমি তো রাখিনি। যে যাবে তাকে যেতে দিয়েছি, পিছু ডাকিনি। দেখেছি গঙ্গা থেকে এক ঘড়া জল তুললে, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাটতি ভরে যায়; এতটুকু চিহ্ন রেখে যায় না। আমার ছাবড়াও তেমনি করে, শীতের রাতে পায়ের কাছে ঠাঁই করে নিল। কে জানে কি করে ঢুকল, কোথা থেকে এল। এবার কিন্তু সে ভোর হলেও অদৃশ্য হল না। এ যুগে অদর্শন হওয়ার জায়গা কোথায়? আমার ঘরের বাইরের ঝোলা বারান্দায় যে এক ফালি রোদ এসে পড়েছিল, তার সবটুকু জুড়ে ছাবড়া রোদ পোয়াচ্ছিল। তার চেহারাতে এতটুকু তফাৎ নেই। হয়তো স্বভাবেও নেই।

মঙ্গল আমার চা নিয়ে এসেছিল, সে তো ছাবড়াকে দেখে অবাক। বলতে ভুলে গেছি, সেই যে অনিল চৌধুরীর চিঠি নিয়ে বুড়ো রঘুয়া এসেছিল, মঙ্গল হল গিয়ে তার সেই উল্লিখিত নাতি। বছর ১৪ বয়স, রোগা, কালো, কোঁকড়া চুল, কাটা-কাটা নাকমুখ। চোখের মধ্যে একটু হাসির ঝিলিক। নাকি ওদের নতুন গাঁয়ের লোকরা সাধু পথে টাকা কামানোকে ঘৃণা করে। দেখাই যাক। ফিক্ করে হেসে মঙ্গল বলল, 'মোর বেড়ালটে মা, আমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। তবে স্বভাবটে খুব ভাল ছিলনি এখন বুড়ো হয়ে শুধরে গেছে বোধ হয়।' আমার নাতি শিব তাই শুনে বলল, 'সব জিনিস বরফ-পেটিতে থাকে। সে কি আর ও খুলতে পারবে?' তাই শুনে ফিক করে হেসে মঙ্গল বলল, 'আন্নাঘর থেকে ছোট মুড়োটি নেছে।'

বলা বাহুল্য ছাবড়া থেকে গেল। নতুন নামে। নাম হল হুলো। বেশ নাম। মঙ্গল হঠাৎ বলল, 'চোখে ভালো দেখে না গো মা।' সবাই শিউরে উঠল, 'না, না, ওকে রেখে কাজ নেই। মহা জ্বালাবে।' মঙ্গল চুপসে এতটুকু হয়ে গেল। 'তা হলে কোথায় যাবে? আমি ছাড়া ওর যে কেউ নেই।' আমি বললাম, 'আমি

আছি।' থেকে গেল হুলো। কেউ আর কোনও আপত্তি করল না। ভাবি ছাবড়ার শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল কে জানে।

একতলা থেকে ১০/১২ বছরের বিশু এসে বলল, 'দিদিমণি, তোমার ঝুল বারান্দার তলায় শাদা মৌমাছিরা চাক বেঁধেছে। বাবা রাতে ভেঙে দেবে বলছে। কি হবে। ওরা যে রাতে দেখতে পায় না।' শেষ পর্যন্ত জয় ওদের একটা সরকারি সংস্থার ঠিকানা দিল, তারা এসে মৌমাছিদের কোনও ক্ষতি না করে, চাক সুদ্ধু উঠিয়ে নিয়ে গেল। আমরা সকলে নিশ্চিন্তে গুছিয়ে বসলাম। এক মাসের মধ্যে এখানকার পুরনো বাসিন্দার মতো হয়ে গেলাম। তারই মধ্যে একবার শুনলাম উড্ স্ট্রীটের বাড়ি ভাঙার কাজ জোর কদমে চলেছে। জয়ন্তীর খাতাখানি পড়ার একটুখানি অবকাশ পেলাম না।

সেকালে সায়েবরা বলত, প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করতে হয় না। তা হলেই সংসারের সব শান্তি নষ্ট হবে। মিসেস্ অ্যালেন বলে এক মেম অনাথ বেড়ালদের জন্য একটা হোম করবে বলে মাসে মাসে এসে আমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেত। তার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। এক অবস্থাপন্ন বুড়ি ১০টা ভালো জাতের বেড়াল নিয়ে তার লন্ডনের ফ্ল্যাটে ২০ বছর ছিল। সেই বেড়ালদের কি যত্ন। ছাদের ওপর ফ্ল্যাট, বেড়ালরা সেখানে খেলে বেড়াত। আগে বুড়ির সঙ্গে মস্ত গাড়িতে রোজ হাওয়া খেতে বেরুত; তারপর কি একটা কোম্পানি ফেল করাতে বুড়ির অবস্থা পড়ে গেল। গাড়ি গেল, চাকর দাসী গেল, কিন্তু বেড়ালরা রইল। কারও সঙ্গে বুড়ি মিশত না। ঘরের বাইরে যা ডেয়ারির ছোকরা রোজ বড় বড় চার বোতল দুধ রেখে যেত, পরদিন খালি বোতল নিয়ে, তাজা বোতল রেখে যেত। হঠাৎ দেখে চারটে বোতল সব যেমন কে তেমন! বেল দিল, টোকা দিল, হাঁকডাক করল, কোনও সাড়াশব্দ নেই। খালি বেড়ালদের করুণ কান্না। শেষ পর্যন্ত অন্য বাসিন্দাদের ডেকে, পুলিশ ডেকে, দরজা ভেঙে দেখে বুড়ি বসবার

ঘরের কৌচে বসে স্বর্গে গেছে। বেড়ালরা চারপাশে ঘুরছে আর ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে। সেই আট বোতল দুধ তারা খেয়ে শেষ করে, একবার গা ঝাড়া দিয়ে, সেই যে স্যাঁৎ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উধাও হল, ও-বাড়ির কেউ আর কখনও তাদের চোখে দেখেনি।

আমরা মাখামাখি করেই থাকতাম। বিকেলে বিমলের মা বলে এক অচেনা প্রতিবেশিনী এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের গুষ্টির যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়ে বলল, 'দুপুরে কি রান্না হয়েছিল?' বুঝলাম সে আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাগিদার হতে চায়। খেতেও চায় না, পরতেও চায় না। খালি সঙ্গী হতে চায়। বললাম কি হয়েছিল না হয়েছিল। কেমন উৎরেছিল, তাও বললাম। সে বলল 'ঐ কাঁচা পোস্তোর অম্বলটা পরে একদিন শুনে যাব। মাসিমা, এবার একটু শুয়ে পড়ুন।'

নাতনিরা চটে লাল, 'ও কি রকম গায়ে পড়া স্বভাব, দিদিমণি, তুমি বলে দিলে না কেন—আমরা কি খাই না খাই তাতে ওদের কি?' বোঝে না যে ওদের কিছু নয় বলেই কথাটার দাম আছে। বাঁচবার গণ্ডিটা যেমন ছড়িয়ে পড়ছে, কথায় কথায় বিলেত, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া! হৃদয়ের গণ্ডিটা ততই ছোট হয়ে আসছে! মাঝে মাঝে দম আটকে আসে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি ৭০/৭৫ বছর আগে পাহাড় দেশে আমাদের চারদিক ঘিরে থাকতেন সে যে কত মামা-মামি, কাকা-খুড়ি, মাসি-মেসো, দাদা-দিদি। মনে আছে মায়ের একবার শক্ত অসুখ করেছিল; ঘন ঘন বড় ডাক্তার আসতেন; অস্ত্র করার কথা হয়েছিল। সেই সময় বাবার জুনিয়র আমাদের লালুকাকা এসে আমার দিদির হাতে এক তোড়া নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'মা বাবাকে বলে কাজ নেই। আমিও তো তোদের বাড়ির একজন। দরকার হলে খরচ করিস।' শেষ পর্যন্ত অস্ত্র করার দরকার হয়নি। মা সেরে উঠলে দিদি টাকাটা মা-কে

দিতেই মার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। বাবা টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কাকাকে বলেছিলেন, 'দরকার হলে আমিই চেয়ে নিতাম। তুমি একটা পাগল।' অনেকে কাকাবাবুকে খরচে বলত, শৌখিন বলত, বিলিতি মদ খেতেন বলে নিন্দা করত। আমার তাঁর কথা মনে হলেই মনটা ভালো হয়ে যায়।

এতদিন পরে জয়ন্তীর খাতাখানি খুলে দেখবার সময় পেলাম। লেখাগুলো ফিকে হয়ে গেছে। বলেছি তো তারিখ নেই। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলেত যান, তারও আগে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে মনে পড়ল। আমি তাঁকে দেখেছি। ছোটখাটো সুন্দরী, হাতির দাঁতে খোদাই করা মুখ। বালিগঞ্জে তাঁর কন্যা ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর মে-ফেয়ারের বাড়ির কাছে তাঁর একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাম এভেনিউয়ের বাড়িতে থাকতেন। সুরেন্দ্রনাথের চুল সব সাদা ছিল। বড় বিদ্বান, ভালো মানুষ ছিলেন। লেখাপড়ায় ডুবে থাকতেন। তাঁরও সুন্দর চেহারা ছিল। কি রং সবাকার! তা সুরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অকালেই স্বর্গে গেলেন। দোতলার ব্যালকনির কোণে তাঁর পড়ার টেবিলটি খালি পড়ে রইল।

হাউমাউ করে কান্নাকাটির বংশ নয় ওঁদের। শোক বহন করেন নিঃশব্দে। জ্ঞানদানন্দিনী অনেক দিন থেকেই সাংসারিক ব্যাপার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এলোমেলো কথা বলতেন না, কিন্তু কতটা বুঝতেন বোঝা যেত না। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার কয়েক দিন পর, হঠাৎ ইন্দিরাদেবীকে বললেন, 'হ্যাঁরে বিবি, ঐ ডেস্কে একটা পাকা চুল বুড়ো বসে দিন ভর কি সব লিখত, তাকে তো ক-দিন দেখছি না। তার কি হল?' ইন্দিরাদেবীর চোখে জল এসেছিল, তিনি বললেন 'কাকে বুড়ো বলছ মা? ও তো সুরেন্দ্র, তোমার ছেলে। সে স্বর্গে গেছে।' জ্ঞানদানন্দিনী এক গাল হেসে বললেন, 'দূর, কি যে বলিস! ও সুরেন হবে কেন? আমার সুরেনকে

আমি চিনি না? সে রাজপুত্রের মতো সুন্দর।'

ভাবি ঐ ডাইরি লিখেছিলেন যে জয়ন্তী, তিনি কি জ্ঞানদানন্দিনীর সমবয়সী ছিলেন?

জয়ন্তীকে ফেলে রেখে তাঁর স্বামী কেন বারেবারে নানা কাজে বিলেত যেতেন? জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামী তাঁর আনাড়ি কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে পুত্রকন্যাসহ বিলেত রেখে এসে, নিজে দেশে ফিরে প্রথম দিশি আই-সি-এসের কর্তব্য পালন করতেন। দেখতে দেখতে জ্ঞানদানন্দিনী সব দিক দিয়ে চৌকোস হয়ে উঠেছিলেন। ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। সে হল গিয়ে ১৮৭৮-এর কথা। জয়ন্তীর তত্ত্বাবধানে উড্ স্ট্রীটের বাড়ির সংশোধন শেষ হয়েছিল হয়তো ১৮৫০ সালে। মহারানি ভিক্টোরিয়া তখন দুনিয়ার নারী জাতির আদর্শস্থানীয়া! শুনেছি তিনি তাঁর স্বামীকে এমনি কড়া শাসনে রাখতেন যে সে বেচারি অকালে স্বর্গে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন! ভিক্টোরিয়াই কি জয়ন্তীর আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন? মনে মনে সে চিত্রের সঙ্গে কোথাও সবুজ, কোথাও বেগ্‌নি কালি দিয়ে আনাড়ি হাতে লেখা, কালের প্রকোপে হলদে হয়ে যাওয়া রং ফিকে হয়ে যাওয়া, হয়তো চোখের জলে ধেবড়ে যাওয়া খাতার পাতার মিল পাই না। দু'চারটে সুগন্ধী ফুলও ছিল খাতায়। এখনও তার সৌরভ উপে যায়নি। তার নাম ছিল জয়ন্তী, কিন্তু তাকে বদলে রিমা বলে ডাকা হতো।

জয়ন্তী লিখেছে : "আমাকে এরা ডাকে রিমা বলে। ভুলে ভুলে যাই, উত্তর দিই না। হয়তো বিরক্ত হয়। আমার স্বামীর দেওয়া নাম। ওঁকে দেখে হঠাৎ সায়েব বলে ভুল হয়। ফরসা রং, চোখ দুটো গাঢ় ছাই, কিম্বা নীল। একেক আলোতে একেক রকম দেখায়। খুব ভালো দেখতে। বেজায় ভয় পাই। কিছুতেই খুশি করতে পারি না। বিয়ের পর বলেছিলেন, 'জানো তো তোমার ঠাকুমা আমার ঠাকুমার সই ছিলেন। তাঁরাই আমাদের বিয়ে ঠিক করে দিয়েছিলেন। নইলে অমন গোঁড়া বাড়ির মেয়ে কি আমার বাড়িতে মানায়। আমি আশা করে আছি মিসেস স্টিলিংওয়ার্থ তোমাকে ইংরিজি বলতে আর বিলিতি আদব কায়দা শিখিয়ে দেবেন। তোমার চেহারা সুন্দর, পণ্ডিতের বংশ তোমাদের, আমি আশা করি দু-তিন বছরে তুমি এবাড়ির কর্ত্রী হবার উপযুক্ত হবে। বিলেতে বিবাহিত ছেলে-মেয়েরা মা-বাপের সঙ্গে থাকে না। আমার মা-বাবাও শ্যামবাজারের বাড়িতেই থাকবেন। এখানে বেড়াতে আসবেন। আগের থেকে খবর দিয়ে। কিম্বা আমরা বললে।'

একটা কথাও বলিনি। কথা শুনে যত না রাগ হচ্ছিল, তার চাইতেও বেশি ভয় হচ্ছিল। মা বলে দিয়েছিলেন, 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য স্বামী যেমনটি চান, ঠিক তেমনটি হওয়া। দেখিস যেন আমাদের নিন্দা না হয়।' কিন্তু এমনটি হবে আমি ভাবিনি। বিয়ের গোলমাল চুকলেই, শ্যামবাজারের শ্বশুরদের পৈত্রিক বাড়ি থেকে

সায়েব পাড়ার ভাড়া বাড়িতে এলাম। প্রথম দিন দুপুরে জীবনে প্রথম ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে চেয়ারে বসে, টেবিলে খেলাম। এর জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। মনে আছে ধবধবে সাদা টেবিলের চাদরের কোণাটা আমার কোলের উপর পড়ছিল। আমার সর্বাঙ্গ সক্‌ড়ি হয়ে যাচ্ছিল। টেবিলের এক মাথায় শ্বশুরমশাই বসে ছিলেন। আমাকে ডেকে পাশের চেয়ারে বসিয়েছিলেন। আমি তো আর আমাতে নেই। তারপর ছুরিকাটা দিয়ে যখন এক টুকরো পাখির মাংস কেটে নিজের পাত থেকে আমার পাতে আদর করে তুলে দিলেন, তখন আমার গা গুলোতে লাগল। আমাদের বাড়ির মেয়েরা মাংস খায় না। টেবিলের অন্য মাথা থেকে আমার শাশুড়ি বললেন, 'ভয় নেই, এটা হাঁসের মাংস। যা ভাবছ তা নয়।' হাতে করে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেললাম। অমনি আমার সক্‌ড়ি খানা ঘুচে গেল। এই প্রথম মনে হল ও-সব মানামানির খুব দাম নেই। আমার শ্বশুরমশাই খুশি হয়ে বললেন, 'এক নম্বর বাঁপ।' তাহলে আমার মনের কথা ওঁদের অজানা ছিল না!

বাড়িতে আমরা মেয়েরা রান্নাঘরের সামনের দাওয়াতে সারি সারি পিঁড়িতে বসে, সকলের খাওয়ার শেষে, আনন্দ করে খেতাম। বুড়ি বামুন-দিদি নিজে পরিবেশন করত। বাইরে বড় একটা খেতাম না আমরা। মাংস বা ডিম আমরা ছুঁতাম না। ও-সব হল গিয়ে ব্যাটাছেলেদের ব্যাপার। কিন্তু মেয়েরা সবাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে বাংলা সংস্কৃত আর হিসাব লিখতে শিখতাম। এতদিন পর মনে হল আমি একেবারে মুখ্যু! আমার স্বামী বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন। বিয়ের ৭ দিন পরে তিনি ফিরে গেলেন। যাবার আগে আমার হাতে একটা হীরের আংটি পরিয়ে বলে দিলেন 'আমি আশা করে আছি এটা দেখলেই তুমি আমার ইচ্ছার কথা মনে করবে। আর দেখ, হাত থেকে ঐ গুচ্ছের লোহার বালাগুলো খুলে ফেল দিকি।' আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিলাম, 'ওগুলো নোয়া, খুললে স্বামীর অকল্যাণ

হয়।' উনি বললেন, 'যত সব কুসংস্কার।' আমার শাশুড়ি ছিলেন সেখানে। পরে একটা একটা করে নিয়ে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'কুসংস্কার ঢাকা পড়ল, মা।' উনি বেঁচে থাকলে আমার জীবনটা অন্য রকম হতো। দুঃখের বিষয় এক বছরের মধ্যে মহামারিতে দুজনেই দুদিন আগে-পরে স্বর্গে গেলেন। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি খসে পড়ল।

আমার স্বামী আসেননি, নাকি কি একটা পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। জ্যাঠতুতো দাদারা শ্রাদ্ধাদি করলেন। দুমাস পরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে গেলেন। আমি আগেও এবাড়িতে যেমন মিসেস বিশ্বাস আর মিসেস স্টিলিংওয়ার্থের হেপাজতে ছিলাম, তেমনি রইলাম। এ-বাড়ির বৌরা নাকি সামাজিক ব্যাপারের সময় ছাড়া বাপের বাড়িতে রাত কাটায় না। স্বামী যদি শ্বশুর-শাশুড়ির একমাত্র সন্তান হন, তবুও না। তাছাড়া আমার বাপের বাড়ির নেটিভিয়ানা আমার স্বামীর দু-চক্ষের বিষ ছিল। কিন্তু নিজের ওপর-হাতে সর্বদা একটা সোনার তাগায় সোনার মাদুলি বাঁধা থাকত। তাতে আমি খুশিই ছিলাম, আহা সুখে থাকুন, নিরাপদে থাকুন। উনি যেমনটি চান, আমি তেমনটি হতে চেষ্টা করব। তবু বার বার মনে হতো পুরুষ মানুষদের মন বোঝা ভার। আমার বাবা এত ভালো লোক, তবুও বেশ অদ্ভুত। দাদাও তাই।"

ঐ পর্যন্ত জয়ন্তীর লেখা। তারপর খাতার কয়েকটা পাতায় খালি আঁকিবুকি কাটা। কয়েকটা ফুল চাপা দেওয়া। মনে হয় অনেকদিন খাতা খোলা হয়নি। বলা বাহুল্য ভাষাটা আমার। জয়ন্তীর গোড়ার দিকের লেখা কিছুটা শুদ্ধ বাংলায় লেখা, কোথাও মানেটা অস্পষ্ট। অনেক দিন আগের কথা। সাল তারিখের বালাই নেই। কিন্তু মুখ্যুর মতো লেখা নয়। এক জায়গায় আছে বাপের বাড়িতে সেকালেও ১৪/১৫ বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো না। সকলে বাংলা আর সংস্কৃত শিখত। জয়ন্তীর ১২/১৩ বছর বয়সে

কড়া ব্যামো হয়েছিল; এমন কি সায়েব পাদ্রী ডাক্তার এনে দেখানো হয়েছিল। তাঁর ওষুধ-পথ্যে সেরেও উঠেছিল। তিনিই ১৬/১৭ বছরের আগে বিয়ে দিতে মানা করেছিলেন। জয়ন্তীর ঠাকুমা চটে লাল। ভাগ্যিস জন্মের আগের থেকে সইয়ের নাতির সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন। এদিকে ছেলের মতিগতি সুবিধার নয়। বাড়িতে ইংরেজ মাস্টার রেখে পড়াশুনো করানো হয়েছিল। সে আবার হিন্দুদের ভারী ঘৃণা করত। এত সব কথা জয়ন্তী লেখেনি। হ্যাঁ, মজার কথা হল, শেষ দিন সায়েব ডাক্তার বিদায় হলে, গোটা বাড়িটাকে গঙ্গা জল দিয়ে মোছা হয়েছিল!

আমার বুড়ি দিদিশাশুড়ি তাঁর শাশুড়ি জয়ন্তীর ওপর হাড়ে চটা ছিলেন। কিন্তু মুখের ওপর একটি কথাও বলতে পারতেন না, সব জ্বালা মনের মধ্যে পুষে রাখতেন। সে বড় সাংঘাতিক জিনিস। আপনি আপনি তিল থেকে তাল হয়। দিদিশাশুড়ি বলতেন তাঁর শ্বশুর যে বিলেতবাসী হয়েছিলেন, সে নিশ্চয় জয়ন্তীর মেজাজের জ্বালায়। মাঝেমধ্যে দেশে আসতেন। আসতেই হতো। জমিজমা, জাহাজ কোম্পানির শেয়ার, কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি ছিল। বাপের একমাত্র সন্তান সব কিছুর মালিক। দুঃখের বিষয়, কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে, সম্ভবতঃ জয়ন্তীর-ই চক্রান্তে, তাকে লেখাপড়া করে সমান অধিকার দিয়ে গেলেন। তার পর থেকে বছরে এক-আধবার দেশে ফিরতেন। জয়ন্তীই ছিল এ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। সব কিছু ছিল তার হাতের মুঠোয়। এত দিন আমিও তাই ভাবতাম। খাতাখানি পড়ে অবধি সব গুলিয়ে গেছে। সব কিছু হাতের মুঠোয় ছিল বটে, বাদে তার অনিন্দ্যসুন্দর স্বামীটির হৃদয়খানা। কি জানি সেকালের স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীদের কি সম্বন্ধ হতো। রামমোহন রায়ের শেষ জীবনটুকু, বিদ্যাসাগর মশায়ের শেষ জীবন কি খুব সুখের ছিল? তবে অসাধারণ লোকদের সুখের মাপ-কাঠি আলাদা।

জয়ন্তীর খাতায় লেখা আছে, 'মিসেস স্টিলিংওয়ার্থকে দাঁড়িপাল্লার এক দিকে বসিয়ে মনে মনে অন্য দিকে সোনা দিয়ে ওজন করতে হয়। ওঁর যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সে ২৫ বছর বয়সে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছিল। মিসের গলায় সোনার লকেটে তার ছবিও দেখেছি। ফটো নয়, আঁকা ছবি। খুব খারাপ দেখতে। কাঠঠোকরার মতো। মিস্ বলেন নাকি অপরূপ সুন্দর। আসলে চেহারা সুন্দরটুন্দর কিছু নয়। ভালোবাসার রংটাই সুন্দর।'

মেম বনে যেতে জয়ন্তীর মাত্র চার বছর লেগেছিল। কিন্তু মিসেস স্টিলিংওয়ার্থ জয়ন্তীদের বাড়িতে ২০ বছর ছিলেন। সেখানেই চোখ বোজেন। জয়ন্তীর সঙ্গে একবার মাত্র বিলেত যান। পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে তাঁর অখ্যাত সমাধিটি আছে। জয়ন্তী যতদিন ছিল, প্রত্যেক রবিবার তার ওপর বাগান থেকে তুলে একটি সাদা গোলাপ রেখে আসত। মিসেস বিশ্বাস বাঙালি খ্রিশ্চান, গ্র্যাজুয়েট। ভারী কর্তব্য-পরায়ণা।

জয়ন্তী লিখেছে, 'মিস্ আর মিসেস্ বিশ্বাস, এই দুটি মানুষের কাছে আমার ঋণ শোধ করবার মতো নয়। দুজনে মিলে গড়ে পিঠে আমাকে যখন তৈরি করে দিলেন, আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ৫ বছর ছিলেন মিসেস বিশ্বাস, তারপর মেয়ের কাছে চলে গেলেন। আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাতাম। সেবার আমিও বিলেত গেছিলাম। সেখানে দেড় বছর ছিলাম। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে সময় বিলেতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও ছিলেন। অবিশ্যি আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি একা যাইনি, মিস সঙ্গে ছিলেন। তিনি যেতে চাননি, কলকাতায় কারও থাকা দরকার বলেছিলেন। আমি জোর করে নিয়ে গেছিলাম। সরকার মশাইকে বাড়ির চাবি দিয়ে। ফিরেছিলাম আমার যমজ ছেলেদের নিয়ে। মিস্ তাদেরও মানুষ করেছিলেন।'

বলেছি তো এ-ভাষা জয়ন্তীর নয়। এ গল্পও জয়ন্তীর গল্প নয়। কিন্তু সদাসর্বদা সে আমার মন জুড়ে থাকে। এক জায়গায় সে লিখেছে, 'তিন বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে। উনি যখন যেমন চেয়েছেন, তেমনই হবার তেমনই করার চেষ্টা করেছি। তবু মন পাইনি। কিম্বা মন পেলেও, হৃদয় পাইনি। দুটো এক নয়। আমার বাপের বাড়িতে স্বামীর ভালোবাসার কথা কেউ বলে না। তবে স্বামী গয়না দিলে দেখিয়ে বেড়ায়। স্বামীর দেখাশুনো করে প্রাণ দিয়ে, সারা জীবন ধরে। স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী। কিন্তু স্বামী যদি কখনও একটা ভুল করেন, সে-কথা কি তাদের বলেন? তারা কি ক্ষমা করে? স্বামীকে বিচার করতে বসা যে বড় লজ্জার কথা, এইরকম একটা ধারণা তাদের। তবে তেমন হলে জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যেতেও তাদের দেখেছি।'

জয়ন্তী এক জায়গায় লিখেছে, "ভালোবাসা বড় সাংঘাতিক জিনিস, আবার তাকে ছাড়া বাঁচাও দায়। সব কাজে সে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মানুষকে স্বার্থপর করে দেয়, আবার তার জন্য সব ছেড়ে দিয়ে সুখে নিঃস্ব হওয়া যায়। যেদিন শিব আর শংকরকে নিয়ে মিসের সঙ্গে ফিরে এলাম, আমার স্বামীও সঙ্গে এসে, এক মাস ছিলেন। সরকার মশাই দেখলাম সদর দরজার উপর আমপাতার মালা বেঁধেছেন; দরজার দু-পাশে মঙ্গল ঘট বসিয়েছেন। তাঁর বাড়ির মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এক বছরের ছেলে দুটো হেসেই কুটোপাটি! সবাই বলল, 'রিমা, এবার তোমার জীবনের ষোলো কলা পূর্ণ হল।'

তাই বটে। এই প্রথম আমার স্বামী আমার বাপের বাড়ি গিয়ে, নিজেদের বংশের পুরনো নিয়মের জন্য ক্ষমা চেয়ে, আমার মা বাবা ভাই বোনকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বললেন আমার ইচ্ছামতো আমিও বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব। পুরনো নিয়মটি বড় নিষ্ঠুর। আমাদের বেয়ারা বাবুর্চির সংসার দেখে তাঁদের তাক লেগে

গেছিল। বাবা ধুতির কোঁচাটি তুলে ধরে হাসি মুখে সব ঘরদোর দেখে, দুই নেপালী আয়ার কোলে ছেলে দুটিকে দেখে, আলগোছে দুটি গিনি দুজনার হাতে দিয়ে, আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'বাঃ, বেশ মানিয়েছে! তোমরাও যেমন সায়েব বনেছ, এরাও তেমনি ফুটফুটে সায়েবের বাচ্চা হয়েছে।' খাননি কিছু আমাদের বাড়িতে ওঁরা। পরের বছর কলকাতার বাস তুলে দিয়ে ওঁরা সকলে কাশী চলে গেছিলেন। সেখানেও অনেক সম্পত্তি ছিল। শরিকরা রইল কলকাতার বাড়িতে। আমি কখনও কাশী যাইনি।"

দিদিশাশুড়ি যাকে আমি দিদিমণি বলতাম, তিনি জয়ন্তীর উপর হাড়ে চটা ছিলেন। বলতেন, 'রক্ত মাংসের মানুষ তো ছিল না সে, হৃদয় বলে কিছু ছিল না। ছেলে দুটোকে কোলে পিঠে করতে দিত না। নাকি ওদের বাপের পছন্দ নয়। তাই না আরও কিছু! আসলে যদি কিছু করে, যদি ভিজিয়ে দেয়! একটু বড় না হতেই ঘরে সায়েব মাস্টার এল। তাপ্পর তারা বোর্ডিং-এ গেল। তাপ্পর বিলেত গেল। তাপ্পর একজন রামকিষ্টান হয়ে হিমালয়ে গেলেন আর একজন আমাকে উদ্ধার করলেন! আমার বাবাও তেমনি! আরে সায়েবে যদি এতই শখ তো একটা বিলিতি সায়েব ধরে দিলেই তো হতো!! বেশ সেজে গুজে মহারানির ছেলের সঙ্গে বল্ ডান্স করতাম। এ সায়েবের মন জুগোতে তো আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছিল।'

যা মুখে আসত বলে যেতেন দিদিমণি। হয়তো তেমন সুখ পাননি জীবনে। ভারী দেশপ্রেমিক ছিলেন ওঁর স্বামী। বিলেতে পড়াশুনো করেছিলেন। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন। এইরকম এক দল মানুষই আমাদের দেশপ্রেম শিখিয়েছিলেন। সমস্ত অধীত বিদ্যা এনে দেশের সেবায় লাগাতেন। দেশের দোষগুলো দেখে ধৈর্য হারাতেন। বিলেতের নকল করতে চাইতেন। স্বদেশকে ভালোবাসতেন বলেই। দিদিশাশুড়ি সারাজীবন সুখ সুখ করে হেদিয়ে মরেছিলেন। তাঁদের বাড়িতেও যথেষ্ট

সাহেবিয়ানা ছিল, কিন্তু সে বড় আরামের জিনিস। তখনকার কত যে মজার কথা শোনা যেত। পাতিয়ালা না কোথাকার যেন মহারাজা সপরিবারে নিজস্ব জাহাজে ট্যাংকি ভরা গঙ্গা জল নিয়ে, হিন্দুমতে বিলেত যাত্রা করেছিলেন! সে-ও এক মহাভারত!

দিদিশাশুড়ির নাম ছিল অদিতি, সবাই ডাকত অ্যাডি। কোথাকার জমিদার বাড়ির রূপসী মেয়ে, কনভেন্টে পড়তেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীরও আগে মনে হয়। ঐ পর্যন্তই বিদ্যা। কোথায় কোন পার্টিতে মায়ের সঙ্গে ঐ মেয়েকে দেখে জয়ন্তীর ছেলে পছন্দ করে বিয়ে করে এনেছিলেন। তাঁর মনে ধরেছিল কি না জানি না, তবে অ্যাডির উচ্চাশা যে ব্যর্থ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মনে হয় জয়ন্তী তাঁকে নিজের মাপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। ততদিনে সাঁকোর তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছিল, রবীন্দ্রযুগের সূত্রপাত হয়ে গেছিল। দিদিমণির স্বামী শিব সুযোগ পেলেই, তাঁর ঐ সুন্দর চেহারা আর জ্ঞানবিদ্যার সম্পদ নিয়ে বোলপুর চলে যেতেন। নাক সিঁটকে দিদিমণি বলতেন, 'সেখানে ঐ বেম্মজ্ঞানী পিরিলি বামুনের বাড়িতে মোটা চালের কাঁকর মেশানো ভাত আর আলুর ঝোল খেয়ে কেতাথ হয়ে ফেরে। আরে মুছলমানের রান্নাঘরের মাংসের গন্ধ শুঁকেই তো ওরা গুষ্টিসুদ্ধু পতিত হয়ে আছে, তোর তাদের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? আমারও কোনও গোঁড়ামি নেই বাপু, আমাদের মেম গভর্নেস ছিল, বাবা গভর্নরের বাড়ির পার্টিতে যেতেন। কত বললুম কার্ড ফেলে এলেই নেমন্তন্ন পাবে। তা হেসেই কুটোপাটি। লাটসায়েবের সঙ্গে নাকি কোথায় পোলো খেলেছেন। বললেন, "ভারী মাই-ডিয়ার লোক। আবার কার্ড ফেলতে যাব কেন?" কি আর বলব নাতবৌ, মনের জ্বালাগুলো ঝাড়বার লোক পাইনে।'

একবার বলেছিলাম—'দাদুকে অনেকে মহাপুরুষ বলত। ঘাটালে বড় বন্যার সময়ে কি না করেছিলেন। দেবতুল্য লোক ছিলেন।'

তাই শুনে দিদিমণির কি হাসি! 'আরে সে তো ঐ খ্যাপাটে রামকৃষ্ণ বিদ্যারত্নের সঙ্গে। সে-ও কি বৌকে কম জ্বালিয়েছিল। তার হাজার মানা সত্ত্বেও গেলেন সেই ঘাটালে। বৌ রেগে বলল, "যদি যাও তো ফিরে এসে আমার মরা মুখ দেখবে!" তাও শুনল না, গেল চলে। ফিরে এসে দেখে বৌ সত্যি সত্যি রক্ত বিষিয়ে মারা গেছে। ঠিক সাজা হয়েছিল! কিন্তু ওদের কথা বাদ দে! আমার শাশুড়ি কি তার একমাত্র সন্তানকে আটকে রাখতে পারতেন না? একটি তো সাধু হয়ে হিমালয়ের কোন মঠে এখনও মুক্তির পথ খোঁজেন। ইনি মাত্র পঁচাত্তর বছর বয়সে ড্যাংড্যাং করে সঙ্গে গেলেন। রোগ না, কিচ্ছু না। এক সকালে হঠাৎ বললেন, "অ্যাডি, আমি গেলাম। মা ডাকছেন।" ব্যস্ শুয়ে পড়লেন। মা-টির আক্কেল দেখলি? মরেও হাল ছাড়েনি।'

জয়ন্তীর খাতার এক জায়গায় লেখা আছে, 'ভগবান, এ জীবনে অনেক ভুল করেছি, দোষ করেছি, সকলকে আমার পথে চালাবার চেষ্টা করেছি। তুমি সব ক্ষমা করবে জানি। শুধু আমার স্বামীকে আর তাঁর ছেলে দুটিকে নিজের নিজের বাছা পথে সুখী কোরো।' আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। জয়ন্তীর কথা ভাবলেও আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করে। সুখ বড় ছোট জিনিস। সুখ সে কোনও দিনও চায়নি। এক জায়গায় লিখেছে, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না। সকালে আমার একতলার চানের ঘরের বাইরের দরজাটি খুলতেই একটা সর্বাঙ্গে রক্ত মাখা, হয়তো কোনও দুর্ঘটনা বিধ্বস্ত লালচে রঙের কুকুর কোনওমতে শরীরটাকে টানতে টানতে আমার পায়ের ওপর মাথা রাখল।

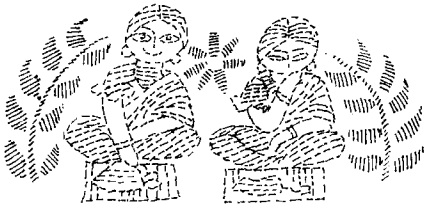

আগে ভাবতাম এই ৬০/৭০ মতো বয়স হলে দিব্যি মনের শান্তিতে থাকা যাবে। সংসার চালাবে অন্যরা, ভাবনা-চিন্তা হবে তাদের, আমি মনের শান্তিতে আঁকব আর লিখব। যে-সব অপূর্ব ছবির স্বপ্ন দেখি, সব কাগজে নামিয়ে ফেলব। ভাবি এক, হয় আর এক। মন বড় জ্বালা। ওটার কথা আগে ভাবিনি। ও যে আমার এমন শত্রু তাও বুঝে উঠতে পারিনি। ভালো মনে করে কাজ করে অন্যে, আর আমি ভেবে মরি! ভাবি এই ৮২ বছর বয়সে লোকে শয্যাশায়ী হয়, বিড়বিড় করে আপন মনে বকে, ভুলভাল বলে, সন্ধ্যে না লাগতে একটু দুধ-খই খেয়ে, শয্যা নেয় আর বাড়ি সুদ্ধু লোকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আমার আবার অন্য জ্বালা। বুড়ো হয়েছি কবে তা টের পাইনি। হঠাৎ কেমন নাতি-নাতনিদের ধরে ফেললাম। ওরাও আমাকে সমবয়সী পেয়ে অনেক কথা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে ফেলত। জানত ওদের দিদিমণিকে বলাও যা, একটা অতল কুয়োতে ফেলে দেওয়াও তাই। আমার ছেলে জয়; দেখতে দেখতে তার বয়স পঞ্চাশের কোঠার অর্ধেকটা পার হয়ে গেল! এই তো আমার ৫০ বছরের জন্মদিন করা হল মাত্র সেদিন! আমার স্বামী বললেন, 'না, তা বললে চলবে না। অর্ধ-শতাব্দী পার করলে, যেমন তেমন কথা নয়!' মনে আছে বাড়ির লোক নিয়ে ৫০ জনের ভোজ হয়েছিল। আমাকে কিছু করতে দেয়নি। হাত গুটিয়ে সারাদিন বসেছিলাম আর রাজ্যের ভাবনা ভেবেছিলাম। সারা জীবন ধরে কবে কি অন্যায় কাজ করেছি, কাকে কি হৃদয়হীন কথা বলেছি, সব মনে পড়েছিল। আরও মনে পড়েছিল, তারও ২৭ বছর আগে শান্তিনিকেতনের এক বন্ধুর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে একটা অন্ধকারময় ছবি আঁকলেন। আমরা বললাম, 'বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে শোনা যাচ্ছে আর আপনি মনে হচ্ছে একটা মরা মেয়ের ছবি এঁকেছেন?' বললেন, 'ও আত্মহত্যা করেছে। তোদের কি মনে হয় না আমাদের দেশের মেয়েদের বিয়ে মানে আত্মহত্যা। নিজের মনের সব শখ-সাধ, সব সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে সংসারী হওয়া।' পরে মনে হয়েছিল ঐ চিন্তাটা তাঁর মনে বড় ব্যথা দিত। তাঁর 'মুক্তি' কবিতাটিতেও ঐ একটা বেদনার সুর। এখনকার জগৎকে দেখলে হয়তো খুশি হতেন, কেমন তারা স্বাধীন ভাবে চরে বেড়াচ্ছে আর সামাজিক সমস্যা বাড়াচ্ছে! রবীন্দ্রনাথও নিজের মেয়েদের সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে নিতান্ত কচি বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও বোধ হয় এ-সব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেননি।

সে যাই হোক সল্ট লেকে গুছিয়ে বসতে না বসতেই, বুঝলাম নির্ঝঞ্ঝাট, নির্ভাবনা সংসার বলে কিছু হয় না। হওয়া সম্ভবও না। পাঁচটা পাঁচ রকমের মানুষকে একটা বাড়িতে পুরে দিলেই সমস্যা চুকে যায় না। উড় স্ট্রীটের ছড়ানো বড় বাড়িতে সবটা চোখে পড়ত না। তাছাড়া সেকালটা আমাকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রাখত। সাদা চোখে সব কিছু দেখতে পেতাম না। এখানে দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটের পরস্পরের সঙ্গে লাগোয়া ঘরে বাস করাতে কারও কোনও মনের কথা লুকিয়ে রাখার জো ছিল না। গোড়ায় নিজের মনের মধ্যেই ডুবে ছিলাম, অতটা লক্ষ্য করিনি। সন্ধ্যাবেলায় মঙ্গল এসে বলল, 'দিদিমণি, রোজ রোজ রাত দুপুরে দরজা খুলতে আমার ভয় করে।' শুনে আমি অবাক! 'ভয় করে কেন রে?' 'তেনারা যদি অন্দরে সেঁদোন!' আমি আকাশ থেকে পড়লাম। 'তেনারা কারা

রে?' মঙ্গল ইদিক উদিক তাকিয়ে বলল, 'সেই যে রাতে যাদের নাম করতে নেই।' বললাম, 'এ্যাঁ! তারা আসে নাকি?' 'আসতে কটুক সময় লাগে! যদি বড়দা সেজেই আসে?' বললাম, 'ছায়া পড়বে না। আচ্ছা, যা, দেখি বলে।'

আমাকে কিছু বলতে হয়নি। মঙ্গল হয়তো কিছু বলে থাকবে। জয় এসে আমাকে বলল, 'আর কার সঙ্গে পরামর্শ করি, মা, সুমনটা কিন্তু রোজ রাতে ফেরা ধরেছে, বখেটখে যাচ্ছে বলছি না, কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, পাড়া নিঝুম হয়ে যায়, যদি কোনও বিপদে পড়ে? ওর মা তো কেঁদেকেটে এক-সা করছে।' আমি বই নামিয়ে বললাম, 'আমার হিসাবে ওর ২৪বছর বয়স, চাকরিতে ঢুকেছে। ওর ভালোমন্দ বোঝার যথেষ্ট বয়স হয়নি, খালি তোর-ই ঐ বয়সে হয়েছিল?'

জয়ের কান দুটোকে লাল হতে দেখে বেজায় খুশি হলাম। সে বলল, 'না-মানে-ইয়ে—তখন দিনকাল অনেক ভালো ছিল। তাছাড়া আমি তো ফোটনদের বাড়িতে ব্রিজ খেলতে যেতাম। ১০ মিনিটের হাঁটা পথ।' আমি বললাম, 'তখনও রাস্তা নির্জন হয়ে যেত। তখনও দেশে দুষ্কৃতকারী থাকত। খুন-খারাবি হতো। আমার মাথায় যত পাকা চুল দেখছিস তার অর্ধেকের জন্য তুই দায়ী। ফ্যানি বলে সেই মেয়েটা ফোটনদের বাড়ি যেত না? দোতলার জানলা থেকে পথ চেয়ে চেয়ে—' আর বলতে হয়নি। জয় বলল, 'তবে কি কিছুই বলব না?' 'তা বলবি না কেন? ও জানুক যে বাপ মা কত ভাবে। তোর বাপকে ঠাণ্ডা করতেই তো আমার হদ্দ হতে হতো। বলতেন—আসুক, পিটিয়ে ছাতু বানাব। আর যেই চাবি খোলার শব্দ শুনতেন অমনি সব রাগ পড়ে যেত। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়তেন। এখন সত্যি দিনকাল খারাপ। কেন তা জানিস্? তখন আমরা দেশটাকে ভালোবাসতাম এখন আর বাসি না।'

শেষ পর্যন্ত আমিই সুমনকে বললাম, 'অত রাত করিস কেন? খবরের কাগজ পড়িস না? বুড়ো ঠাকুমা নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোয়, তাও চাস না?' পায়ের কাছে বসে পড়ে সে বলল, 'দিদিমণি, মনে বড় অশান্তি। পথ বলে দেবে? তুমি ছাড়া কে আর বুঝবে? তোমার জীবনকাহিনী তুমি না বললেও, আমি জানি।' আমি বললাম, 'বলবি তো!' সুমন বলল, 'আমি যদি একজন খ্রিশ্চান মেয়ে বিয়ে করি, তুমি কি শক্‌ড্ হবে?' আমি বললাম, 'না। তোর বাবাকে বলিস।'

এক জায়গায় জয়ন্তী লিখেছিল, 'আমাদের বাড়ির হালচাল দেখে মনে হতো নাবায়ণ আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি। অষ্ট ধাতুর তৈরি গ্রীক দেবতাদের মতো দেখতে পাঁচ সেরি ঐ ঠাকুরটির ক্ষমতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন নিখুঁৎ ভাবে চলে আমার সেই বিশ্বাস ছিল। আমাদের সকলের ওপর তাঁর যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে সে বিষয়ে আমার মনেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি এতই উদার মহান যে আমাদের বংশের ছেলেমেয়েদের যারা বিয়ে করে, তারাও তাঁর কৃপা দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় না। একবার-ও মনে হতো না এর মধ্যে আমাদের নিজেদেরও কিছু করণীয় আছে। নিশ্চিত জানতাম পূর্ব জন্মে আমরা সবাই অনেক পুণ্যকর্ম করেছিলাম, তারই ফলে এ-জন্মে এই বংশে জন্ম কিম্বা বিয়ে হয়েছে। আমার ঠাকুমা আর আমার দিদি শাশুড়ি যে শ্যামবাজারের পাশাপাশি দুই বাড়িতে ৯/১০ বছর বয়স পেরুতে না পেরুতে বৌ হয়ে এসেছিলেন, সে-ও সম্ভবতঃ আমাদের ঐ সুদর্শন দেবতাটিরই কীর্তি এবং আমার নিজের বিয়ের জন্যেও তিনি ছাড়া কেউ দায়ী নন। এভাবে দেবতার ঘাড়ে পরে বংশানুক্রমে দিনপাত করেছিলাম। বেথলেহেম শহরের ঈশা বলে সেই ছুতোরের ছেলেটাকে ঘৃণা করতাম।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বলে যে বেম্মজ্ঞানী লেডি ডাক্তার আছেন, তাঁকে হাওড়ায় আমার মামার বাড়িতে কোনও বৌয়ের চিকিৎসার জন্যে তাঁরা নিয়ে গেছিলেন। তিনি নিজের ঘোড়ার গাড়ি চড়ে

গিয়ে, সারা রাত জেগে বৌয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে, পরদিন বিকেলের আগে বাড়ি ফিরতে পারেননি, তাই দুপুরের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল বারান্দায়। কাদম্বিনী আর তাঁর সঙ্গিনী হেমাঙ্গিনী পাশাপাশি কুশাসনে বসে একবারে একসঙ্গে কলাপাতার ওপর সাজিয়ে দেওয়া ভাত তরকারি থেকে দই সন্দেশ অবধি খেয়ে, বামুন ঠাকুরের অনুরোধে নিজেদের এঁটো নিজেরাই তুলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। মনে আছে তাঁরা একটুও রাগ করেননি, বরং মনে হল তাঁদের যেন খুব হাসি পাচ্ছে। তাই দেখে মামিরা অবাক। পরে বলেছিলেন, হাত যশ আছে কিন্তু বলতে হবে। দাইমা তো জবাব দিয়ে চলে গেছিল। এখন মা-ছেলে দুজনেই দিব্যি কলকল কচ্ছে! এঁটো সাফ করবে না তো কে করবে? বেম্মতে আর খিরিস্তানে তফাৎটা কি? তখন কিন্তু আমারও ওদের মতোই মনে হয়েছিল। এখন শিব আর রূপ অনাচারের এক শেষ করছে, একটু বিরক্তিও লাগে না। ঐ ছুতোরের ছেলেতে আর নারায়ণে তফাৎ ঘুচে গেছে।'

হয়নি কোনও গোলমাল। সুমন বোম্বাই বদলি হয়েছে, দু'বছর পরে একটা উন্নতি হবার কথা। তারপর রেজিস্ট্রি করে ওদের বিয়ে হবে। ভেবে আশ্চর্য হই, আজ যে সমস্যা ভাবিয়ে আকুল করে, কাল সে আপনা থেকেই মিটে যায়। মাঝখান থেকে বৃথাই ভেবে মরি। আজ যে দুঃখ পেয়ে জগৎ অন্ধকার দেখি, কাল তাকে মেনে নিই, উঠি, খাই দাই, হাসি, গল্প করি, কাজকর্ম করি।

আমার স্বামী যেদিন ঘুমের মধ্যে চলে গেলেন, শেষ একটা বিদায়ের কথাও বলে গেলেন না, সেদিন তাঁর শান্ত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছিল। মনে হয়েছিল বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন, শান্তি পেয়েছেন। এক ঝলকে সারা জীবনের সব পাওনাগুলো মনের মধ্যিটাকে আলো করে দিল। বুক ভরে গেল। যে-টুকু দুঃখ পেয়েছি, তখন যতই অসহনীয় মনে হয়েছিল, এখন মনে হল সে কিছুই নয়। তার নয়ভাগ ভুলেও গেছি।

এই সব ভাবছি এমন সময় মঙ্গল এসে বলল, 'তিনি দেখা করতে এয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেছি তেড়িয়ে দিতে, তা যাবেন না কিছুতেই। আপনি একবার আসেন।' বসবার ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠলাম। একটা মাথায় প্রায় আমার সমান উঁচু, বুড়ো শিম্পাঞ্জি, বেতের চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে নমস্কার করল। মনে হল এক্ষুণি কথা বলবে। আমিও নমস্কার করে বললাম, 'বলুন, কি করতে পারি?' সে বুড়ো আঙুল দিয়ে অ্যাশট্রে দেখিয়ে দিল। জয় চুরুট খায়। আমাদের বাড়িময় একটা মৃদু সুগন্ধ লেগে থাকে। আমার ভালো লাগে। ওর বাবাও খেতেন, বলতেন এগুলোর ধোঁয়া মুখ দিয়ে নিয়ে নাক দিয়ে বের করে দিতে হয়, তাই কোনও অনিষ্ট হয় না। দেরাজ খুলে, দিলাম একটা। সে উঠে বাও করে, ডান হাত পেতে, চুরুটটি নিয়ে, আবার নমস্কার করে আস্তে আস্তে পিছু হটে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

মঙ্গল তাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে বলল, 'উনি আমাদের বস্তিতে থাকেন। ছাগলগাড়ি চালান। চুরুট চিবোন। গণি-খুড়ো ওনাকে নিয়ে সার্কাস পার্টি খুলবে, এই শীতকাল থেকে।' আমি তো হাঁ! 'বলিস কি রে? ওর নাম কি?' 'ওনার নাম মিস্টার চিম্প। ঐ যে ফি বছর শীতে মাদ্রাজ থেকে সার্কাস আসত, উনি তাতে ডিগবাজির খেল দেখাতেন। তা মালিক বড্ড মারকুট্টে, তাই উনি পালিয়ে এয়েছেন। কতবার খুঁজে গেছে তারা। তা মোদের ঘরে কেউ গা ঢাকলে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন তেনারা হাল ছেড়েছেন, তাই খুড়ো সার্কাস খুলছে বড় দিনে। কাড পেঠিয়ে দেবে। ১ টাকা করে পিত্যেকে চাঁদা দেবেন, বড়মা।' আমি বললাম 'নিশ্চয় দেব।' হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে মনে মনে স্থির করে রেখেছি, কেউ কিছু চাইলে, খালি হাতে ফিরিয়ে দেব না। যে যা চায় তা না দিতে পারলে, অন্য কিছু দেব। মিঃ চিম্পের সার্কাস

দেখতে যাব বৈকি। আমরা পাড়ার সব কাজে যোগ দিই।

জয়ন্তীর খাতা খুলে দেখি। সে লিখেছে, 'এ পাড়ায় নেড়িকুত্তাদের প্রবেশ নিষেধ। যদি ভুল করে আসে, ফি শুক্রবার হয় তাদের গাড়ি করে ধরে নিয়ে যায় আর কোনও দিন তারা ফিরে আসে না। হয়তো তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়। সায়েবরা সত্যি কুকুর ভালোবাসে, যদিও মাঝেমাঝে মনে হয় ওরা আসলে কুকুরের প্রভু হতে ভালোবাসে। আর আমাদের বাড়িতে কুকুরটুকুর ছিল না। বেড়ালও ছিল না।'

বলেছি তো এটা জয়ন্তীর জীবনী নয়, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় দুনিয়ার প্রথম মায়ের জীবনীর সঙ্গে শেষ মায়ের জীবনীর কি কোনও তফাৎ থাকতে পারে? এটা হল গিয়ে পাঁচ পুরুষের গল্প। জয়ন্তীকে দিয়ে শুরু আর আমার ছেলেমেয়েদের সংসার দিয়ে শেষ। তবে এ গল্পের শুরুও নেই, শেষও নেই। খালি রূপ বদলায়, ভোল বদলায়। একই জন্ম, একই মরণ, মধ্যিখানে এক-ই সুখদুঃখ। এতক্ষণ আমার বাপের বাড়ির কথা বলা হয়নি। তাঁদের অর্ধেক হলেন গিয়ে ব্রাহ্ম। আমি ছোটবেলায় যে ব্রাহ্মদের দেখেছি জয়ন্তীর সময় থেকে তাঁরা তিন পুরুষ এগিয়ে এসেছেন, উভয় পক্ষের পুরনো তিক্ততাগুলো আপনা থেকেই মিটে গেছে। তার জায়গায় নতুন নতুন দুঃখ ভাবনা দেখা দিয়েছে। পট বদলেছে, কিন্তু নটনটীদের মনেমনে সেই একই হাহাকার, সেই একই ব্যর্থতা, বেদনা, অন্ধকারে হাতড়ে মরা।

আমি যখন কলেজে পড়ি তখন চোখে দেখে কে ব্রাহ্ম কে হিন্দু বোঝা যায় না। বই পড়েও কোন লেখক হিন্দু কোন লেখক ব্রাহ্ম বোঝা যায় না। ক্রমে ক্রমে সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তবু বিয়ে থা-র সময় আজ পর্যন্ত একটু তিক্ততার কারণ হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার মানামানি প্রায় চলেই গেছে, জীবনযাত্রা সব একরকম হয়ে গেছে, সবাই পথেঘাটে চলাফেরা করছে। কিন্তু এসব

কোনও মানসিক বিবর্তনের ফল নয়, কোনও মহাপুরুষের স্নেহাশীর্বাদেও নয়। এর পেছনে আছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ। জয়ন্তীর পুরনো দুঃখগুলো আজও তেমনি আছে।

জয়ন্তীর একটা ছোট তেল রঙের ছবি আছে আমার কাছে, সেকালের এক নামকরা শিল্পীর আঁকা। সোজা দাঁড়ানো, মুখখানির তিন ভাগ দেখা যাচ্ছে। নিখুঁত সুন্দর হাতির দাঁতের মূর্তি যেন। মেমি-মেমি দেখতে। মুখে কোনও ভাব নেই। গ্রীক দেবীদের মতো। এরই জোড়া আরেকটা ছবিও আছে আমার কাছে। জরির টুপি মাথায়, আচকান চুড়িদার পরা, দেবদূতদের মতো সুন্দর দুটি ছেলে পা ঝুলিয়ে একটা মখমলের গদি আঁটা ছোট কৌচে বসে আছে আর ওদের পায়ের কাছে অহংকারীর মতো মাথা তুলে বসে আছে লালচে রঙের গা, লোমস ল্যাজ, ছুঁচলো নাক, ওদেরই মতো সুন্দর একটা বিলিতি কুকুর, আইরিশ সেটার।

আমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ছিল পাশাপাশি। দিদিশাশুড়িকে দেখাতেই, তিনি রেগেমেগে উঠে বসেছিলেন, 'ওরা কারা জানতে চাইছিস! ওদের চিনলিনে? ওরা আমার সর্বনাশ, আমার অভিশাপ, ঐ শিব আর রূপ! জানিস না, ওদের মনে মনে একটা মন্দির আছে। একটাই মন্দির। সেখানে দেবতা-টেবতা থাকলেও তাকে চোখে দেখা যায় না। আমার মতো সাধারণ লোকদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। একটা অদৃশ্য নোটিস টাঙানো আছে। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেবার সাধ্যি ছিল না ওদের। তা চোখে দেখতে না পেলে কি হবে? ওদের বাবাটি সাধে বিলেতে ফেরারি হয়েছিলেন! মনে হয় হাল ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছিলেন। তবে

জয়ন্তীর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। জয়ন্তী যা একবার মুখে উচ্চারণ করত, এ বাড়িতে সর্বদা তাই হতো। একমাত্র সেই বুড়ি মেম নাকি ওর মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পেত। সে যে কি জ্বালা তোকে আর কি বলব!'

ওঁর কথার মধ্যিখানে কিছু বলে লাভ নেই আমি জানতাম। দম নেবার জন্য একটু থামতেই বললাম, 'ছেলেদের জন্য সাহেব টিউটর ছিল শুনেছি আর বিলেতের কলেজে পড়েছিলেন ওঁরা।' শুনে দিদিশাশুড়ির কি হাসি! 'আর বলিস্‌নে মজার কথা। মজার কথা আর কত বলব। হ্যাঁগা, না হয় মেমই বনেছিস্ তাই বলে কি খিস্টানও হয়ে গেছিলি নাকি ঐ বুড়ি মেমের কথায়? জানিস, ছেলেদের পৈতে দেয়নি? নাকি বলেছিল, "বামুনের রক্ত শিরায় বওয়া মহাজ্বালা, তার ওপর একটা পৈতে ঝুলিয়ে বোঝা বাড়ানো কেন?"

—না, নাত্‌বৌ, এ বাড়ির বুড়ো পুরুতের ছেলে ছোট পুরুতের মুখে শোনা, এ কথা মিথ্যে হবার জো নেই! নাকি আরও বলেছিল, পরে ইচ্ছে হয় তো পৈতে নেবে। কেউ বাধা দেবে না। দেবতারা তো সব শোনে, হল-ও ঠিক যা ভয় পেয়েছিল। আমাকে স্যার কে-জির বাড়ির এক পার্টিতে দেখেই শিব-বাবু ভুলে গেলেন। আমার বাবা যেই বললেন, "পৈতে হয়নি, তো বিয়ে হয় কি করে? জয়ন্তী কি বলেছিল জানিস? বলেছিল, "ও তো ইচ্ছে করলেই প্রায়শ্চিত্ত করে, পৈতে নিয়ে বিয়ে করতে পারে। আপনি সব ব্যবস্থা করবেন।" বাবা বললেন, "তাই নাকি?" তখন বিশ্বাস কর, নাতবৌ—আমার নিজের কানে শোনা, জয়ন্তী ঠিক পণ্ডিতদের মতো সুর করে মস্ত এক স্যান্সক্রিট শ্লোক আউড়ে দিল! বাবা পড়ে যান আর কি! ঐ মেমি-মেয়ের সংস্কৃত পড়া বাপের কথা কারও মনেই ছিল না।

হয়েছিলও তাই, খুব ঘটা করেই সব হয়েছিল। আমাদের

বাড়িতে কেউ অত সমস্কিত জানত না, বাবা নিশ্চয় এক বর্ণ মানে বোঝেননি। পুজো আচ্চাও হতো না, পৈত্রিক ঠাকুর দেবতাদের ঠাঁই ছিল জ্যাঠার বাড়িতে। বাবা খরচা পাঠিয়ে খালাস আর দিনরাত লোভী বামুনদের নিন্দা করতেন বন্ধুদের সঙ্গে! মা-র বেশি বিদ্যে ছিল না, তবু মেম হবার চেষ্টার শেষ ছিল না। তাই বলে তো আর কিছু খিস্টান বনে যাননি, কিম্বা তার চেয়েও খারাপ ঐ জোড়াসাঁকোর বেম্মজ্ঞানী! উঃ! দেখতে পারিনে ওদের।'

ঐ অবধি বলেই জিব কেটে বলেছিলেন, 'ঐ যা! নাতবৌ, ভুলেই গেছলাম। আমার ভাদ্দর বৌ, ঐ যে কিটি—ঐ নেকী কিটি গো—সে বলেছিল তোর বাবা নাকি হাপ-বেম্ম! পুরো বেম্ম হবার সাহস নেই, কিন্তু রোববার রোববার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে গিয়ে ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্ করে?' সত্যি বলব একটু রাগ ধরছিল, বললাম, 'ও তো হিন্দু শাস্ত্র থেকে নেওয়া।' দিদিশাশুড়ির কি হাসি! 'তবে আবার কি বলছি, হিঁদুদের কথা নিয়ে বেম্ম বনেছেন! ছ্যা ছ্যা! খিস্টানরা বরং ভালো, যীশুকে দিয়ে প্রেয়ার লিখিয়ে রেখেছে। কনভেণ্টে পড়েছি বাপু, কিছু জানতে বাকি নেই, —আওয়ার ফাদার হুইচ্ আর্ট ইন হেবেন—এই বলতে বলতে দিদিশাশুড়ি টপ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরে যখন আরও জেরা করতে গেলাম, চটে গেলেন, 'যাঃ, কি যে বলিস, তোর কাছে ও-সব বলতে যাব কেন? জানিস, মাঝে মাঝে রবি ঠাকুরের স্বপ্ন দেখি।' আমি খুশি হয়ে বললাম, 'সত্যি, দিদিমণি, অমন রূপ আর দেখলাম না।' দিদিশাশুড়ি বললেন, 'আমার ১৫ মিনিটের দেওর রূপ বলতেন নাকি বিবেকানন্দর রূপের কাছে রবি ঠাকুরও লাগে না। আমি আজকাল একেক সময় ভাবি, ঐ দুই ভাই, শিব আর রূপ—এরাও তো কম সুন্দর ছিল না। কিন্তু কি কঠিন, কি কঠিন, ঠিক জয়ন্তীর মতো!' এই বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমার হাত থেকে রেহাই পেতেন না দিদিমণি। ওঁর শিরদাঁড়ায়

ব্যথা হতো, বড় কষ্ট পেতেন। রেগে বলতেন, 'কি ভেবেছে কি আমার শরীরটা? সবাই আমাকে ফাঁকি দিল, তার ওপর নিজের শরীরটাও শত্রুতা করবে? কম যত্ন করিনি আমি ওর। সত্যি বলব আর কোনও কিছুর এত যত্ন করিনি। এমন কি ছেলেটা যখন জন্মাল, তা হতে পারে রূপের ডালি। কাগজে পড়েছি কেউ তার রূপগুণের জন্য বাহাদুরি নিতে পারে না। সব তাদের রক্তকণিকার মধ্যে থাকে, তা সে রূপই বল আর গুণই বল। হ্যাঁ, তবে তার যত্ন করতে হয়। তা আমি যথাসাধ্য করেছি। ৮৫ বছর বয়সে এমন রং দেখেছিস্ কোথাও? তোর মতো কালো হলেও এতদিনে রূপটান ২নম্বর মেখে সুন্দর হয়ে যেতাম।'

শুনে নিতাম সব কথা—'বুঝলি ৬৪ রকম উপকরণ দিয়ে রূপটান তৈরি আর আমার ২নম্বর এর দুটিমাত্র উপকরণ—সর আর বাদামবাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি ওসবের বেজায় দাম। তা কালো হয়ে জন্মাবি আর পয়সাও খরচ করবি না, তাই হয় নাকি? মোট কথা এমন কিছু বেশি দাম নয় আর সেকালে আরও সস্তা ছিল। ঠাকুরবাড়ির কালো বৌরাও সুন্দুরি হয়ে উঠত। সুন্দুরি মানেই ফরসা। ফরসা হলেই লোকে বলে সুন্দুরি। আমরা রোদে বেরুতাম না। রোদে গেলে ফরসা রংও তামাটে হয়ে যায়।'

দিদিমণি থামতেই বললাম, 'আপনিও তাহলে অনেকবার শান্তিনিকেতন গেছেন?' 'তা আর যাইনি? অমন রূপবান স্বামীকে কেউ একা ছেড়ে দেয়! কিন্তু কি জানিস্, আঁচলে বাঁধিয়া রাখি বাতাসে যায় সে উড়ি। আসলে কি জানিস্, যাদের মন পড়ে থাকে অদেখা মন্দিরে, তারা কাউকে ভালোবাসতেও পারে না। ঘেন্না করতেও পারে না। পৈতেটা ছিঁড়ে গেলে, ফেলে দিলেন আর পরলেন না। অথচ ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের পৈতে হতো। দুঃখ করে কি আর হবে? একে বিলেতে জন্মেছিলেন, তায় জয়ন্তীর কোলে! ওদের শিরার রক্তের রং বোধ হয় লাল নয়। গ্রীক পুরাণের বইতে

পড়েছিলাম দেবতাদের রক্ত রূপোলি রঙের। ভালোবাসতে জানে না। মরার সময় ডেকে বলল,"মা, আসছি!" ওর বাবা কি বলে সঙ্গে গেছিল কে জানে। নাকি দেশে ফিরে এখানেই মরেছিল। জয়ন্তী গরদের থান পরত, নিরামিষ খেত।' এই বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। মনে হল আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু খানিক বাদে চোখ খুলে বললেন, 'থান পরত, নিরামিষ খেত, কিন্তু তাই বলে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে দেখিনি আর ঘোর সংসারী। বাড়ির কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে ঈগল পাখির মতো চোখ। আহা, লোকের ঝি-চাকর থাকে কেন? নিশ্চয় যখন যা চাহিদা তাই মেটাতে। তা তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবার জো ছিল না। ভারী অহংকারী ছিল। কোন বাড়িতে ঝি-চাকরদের বকাবকি করা হয় না, তুই বল্। তা নয়। বলত নিজে সব দিকে চোখ রাখতে হবে, কাউকে কোনও অন্যায় করার সুযোগ দেবে না। তাই হয় কখনও! আহা, গরীব দুঃখী বলেই তো পরের বাড়ি খেটে খেতে এসেছে, তা তাদের ঘরের কথা একটু জিজ্ঞেসও করতে পাব না? বলি না, হৃদয় বলে কিছু নেই। ওর দুনিয়াতে খালি তিনজনের ঠাঁই ছিল। উনি আর ওঁর দুটি গুণধর পুত্র! তারাও মা বলতে অজ্ঞান। বৌ-টৌ কেউ নয়। তাই বলে মিথ্যে বলব না, শিববাবু আমার ভারী যত্ন করতেন, কিন্তু বুদ্ধি নিতে হলে, সেই বুড়ি মা ছাড়া কেউ নয়! পাষাণীর ছেলে তো কিছুটা পাষাণ হবেই। শুনেছি ওরাও নাকি হাসতে হাসতে বিলেত চলে গেলেন পড়াশুনো করতে! আর তিন বছর দেখা নেই। অবিশ্যি জাহাজে আসতে যেতে বড্ড সময় লাগত, তা জানি। আরে,আমার বাবাও তো বিলেত ফেরত ছিলেন। আমাদের বাড়ির সবাই তাঁর কথায় উঠত-বসত। বাবা! ঠোঁট ফাঁক করার জো ছিল না! সেদিক দিয়ে জয়ন্তী ঠাকরুণ ঢের ভালো ছিল। সে চাইত আমি ঘরকন্নার কিছু কিছু ভার নিই। শিববাবুর সঙ্গে আমি সেজেগুজে পার্টিতে গেলে ভারী খুশি হতো। নিজের গয়নাগাঁটি সব

দিয়ে দিল, শ্বশুরমশাই চক্ষু মুদলেই। শিববাবু তাঁর অংশ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি যখন সায়েব দোকানে গিয়ে সেগুলো বদলে মডার্ন ফ্যাশানের জিনিস আনলাম, তখন জয়ন্তী শুধু একবার তাকিয়ে দেখেছিল আর তার ছেলেটি রেগে চর্তুভুজ। বললেন,"এমন জানলে সব ব্যাংকে রেখে দিতাম। আমার মায়ের গায়ের গয়না ওজনদরে বেচে দেবে, ভাবতে পারিনি।"

আমিও ছেড়ে কথা বলিনি। শুনিয়ে দিলাম,"তোমার ঐ গুণের মা-টি তো তোমার ভাইয়ের অংশটি নিজে বেচে টাকাটি মিশনকে দান করলেন, তখন তো কিছু বললে না। ওঁদের দেওয়াও যা, জলে ফেলে দেওয়াও তাই।" শিববাবু খালি বললেন, "তাই বুঝি! দেখেছ তুমি বিবেকানন্দকে?" আমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর আইমা কেঁদে বললেন, 'ওরে, এসব হল গিয়ে রাগের কথা। জয়ন্তী আর তার ছেলেদের পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নই, সে কি আর আমি জানি না ভেবেছিস? জানি বলেই আগুনের মতো দগ্ধায়।' বুড়োমানুষের চোখের জলের কতটুকু দাম, আইমা তা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তাতে তো দুঃখ কমে না।

আরেকদিন বললেন, 'সব কিছু বিলিয়ে দিত, নিজের জন্য কিছু রাখত না। কিন্তু ছেলেরা দুজন ওর প্রাণের প্রাণ, তবু একটা জিনিস তাদেরও দিল না। এই বড় একটা হীরের আংটি। ওর ঐ পদ্মকলির মতো হাতে একটুও মানাত না। মধ্যের আঙুলে পরত। ঘুরে ঘুরে যেত। ওর ঐ পেয়ারের মেম একটা সরু প্লেন সোনার আংটি ওকে বড়দিনে উপহার দিল। বড় আংটি ঠেসে রাখবার জন্য। কারও কথা শুনত না জয়ন্তী, কিন্তু বুড়ির কথায় উঠত বসত—নিদেন পরামর্শ না নিয়ে মন ঠিক করত না। —হ্যাঁরে, বলেছি কি আমার শ্বশুরমশাই শেষ পর্যন্ত ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন আর দু-বছর বাদে ওর-ই কোলে মাথা রেখে সঙ্গেও গেছিলেন। বলি না দুনিয়াটা একটা সং-এর খেল। একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার। তোর

ছেলেমেয়েরা কি একটা পাঁচ-মিশুলি ভাজা খাচ্ছিল, দে না আমাকে।' এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

ভাবি কি আশ্চর্য এ জীবন! বুক জ্বালানো পুরনো দুঃখগুলোও কেমন দিব্যি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়। আইমা তাঁর ভাঙা মন, আহত আত্মসম্মান সব ভুলে গিয়ে পাঁচমিশেলি ভাজা নিয়ে মেতে ওঠেন। উঠে বসে বলেন, 'না, না, পেঁয়াজকুচি লংকাকুচি না থাকলে আস্বাদ হয় নাকি? আর খাব না-ই বা কেন? তিনি তো দিব্যি "আসছি মা।" বলে কোন সপ্তম স্বর্গে মায়ের কাছে চলে গেছেন। আর ঐ রূপটি, তিনিও বেশ বলিহারি! একদিন একটু খোঁজও করে না। মা ভাই তো ড্যাংড্যাং করে স্বর্গে গেলেন, তা আমরা তো আছি। কে তোর ঐ বিবেকানন্দ? সে কি তোর আপনজনদের চাইতে বেশি হল? বলি না হৃদয়হীন। আর আমার ছেলেটাও তেমনি! মহারাজ বলতে অজ্ঞান! শুনে হাসি পেত। তোর ঐ গেরুয়াপরা, নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করা, ন্যাড়া মাথা, কপর্দকশূন্য রূপটি হলেন গিয়ে মহারাজ! তবু মিথ্যা বলব না, ন্যাড়া মাথাই হন আর যাই হন, অমন রূপ আর কোথাও দেখলাম না। ভাগ্যিস সংসার পাতেননি, আর কারও জীবন নষ্ট করে দেননি। কি আর বলব, আগে মাঝে মাঝে দেখা পেতাম, সামনে এসে যেই দাঁড়াতেন, হেসে বলতেন, "ভালো আছ জানি।" রাগে গা জ্বলে যেত, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে করত পায়ে পড়ি। শিববাবুর মা আর শিববাবু ছুটে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন! অমন সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি। রাত কাটাতেন না আমাদের বাড়িতে, খেতেনও না। চলে যাবার সময় শ্যাম—শ্যামকে তোর মনে আছে? ঐ যে বুড়ো বেয়ারা, যে ওঁদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল, নাকি দরকার হলে চড়-চাপড়টাও দিত। আস্পদ্দা দেখলি তো? জয়ন্তীর আস্কারা ছাড়া আবার কি? কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ রূপ মহারাজ চলে যাবার সময় শ্যাম সঙ্গে মস্ত একটা পুঁটলি নিয়ে পৌঁছে

দিয়ে আসত। বলত—মাধুকরী নিয়ে যাচ্ছি! ঢং দেখে গা জ্বলত। কিন্তু চলে গেলে মনে হতো বাড়িটা পবিত্র হয়ে গেছে। শিববাবুও মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে চলে যেতেন। নাকি পাহাড়ে কোথায়, হিমালয়ের পায়ের কাছে। মাঝে মাঝে যেতে চেয়েছি, শিববাবু হেসে বলেছেন, "যাবে কি করে? সেখানে যে মেয়েদের যাওয়া বারণ।"

এমনি করে ভাঙা ভাঙা টুকরো কথা জোড়াতালি দিয়ে উড্ স্ট্রীটের বাড়ির পুরনো ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা করতাম। জয়ন্তীর ছেলে শিব; তাঁর ছেলে দেব; দেব আমার শ্বশুরমশাই; কি যে আদর পেয়েছি ঐ মানুষটার কাছে। তবে সাহেবিয়ানার অন্ত ছিল না। জয়ন্তী হয়তো দেবকে দেখে বড় খুশি হয়েছিল। দেবতো তার গ্যাম্মা বলতে অজ্ঞান! আমার কাছে কত গল্প করেছেন। গ্যাম্মা হল গিয়ে গ্র্যান্ডমা। হয়তো জয়ন্তীর-ই শেখানো। নয়তো মেমের। অবিশ্যি জয়ন্তীর অনিচ্ছায় সে কিছু করত না বুঝেছি। ছেলেরা তাকে মা বলে ডাকত। আহা, তার মতো মিষ্টি ডাক আর কি বা আছে? মায়ের মতো মানুষ কে বা আছে? দুনিয়ার সব ছোট ছেলেমেয়েরা মা ডাক মুখে দিয়ে জন্মায়। মা, মামা, মামি, সবই এক। শ্বশুরমশাইও তাঁর ঐ খুঁতখুঁতে মাকে ডাকতেন 'মাগো'। পুসি বলে মিউ আর আমাদের ঐ অজ্ঞাতকুলশীল ট্যাফি, যার জাত গোষ্ঠির কুলকিনারা নেই, আমার পায়ের কাছে শুয়ে, ঘুমের ঘোরে বলে মম্‌ম্‌ম্! তা গ্যাম্মাই বলুক আর দিম্মাই বলুক, পেটেই ধরি আর নাই ধরি, মা বলে ডাক দিলে অন্তরের অন্তঃস্থল সাড়া দেয়। ধড়ফড় করে বলে—আয়! মা নেই তো মাসিমা পিসিমা কাকিমা মামিমা, যা হয়। আমার আধবুড়ো জয় এসে মা বলে ডাকলে, আমার মন ছুটে যায় শ্লথ পায়ের আগে আগে। আহা, সব মা-হারারা মা পাক।

বাস করি নোনাপানিতে একটা বাড়ির দোতলার দুটো ফ্ল্যাটে আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াই উড্ স্ট্রীটের ঐ বিশাল বাড়ির মধ্যেকার একতলা দোতলা, রান্নাবাড়ি গুদোম-ঘর মায় সরকারমশায়ের

ছোট্ট দোতলা বাড়ি আর সেখানকার সুখ-দুঃখ, বেদনা, হতাশা, আনন্দ। তাতেও মন ভরে না, মন জুড়ে থাকে আমার দিদিশাশুড়ির শাশুড়ি জয়ন্তী, যাকে লেডিজ্ ক্লাবের বিলিতি মেমরা রিমা বলে ডাকত।

প্রমোটার একদিন নিজে এলেন, হাতে একটা ছোট্ট পাথরের কৌটোতে খুদে এক সোনার টিকটিকি; তার সবুজ পান্নার চোখ এখনও জ্বলজ্বল করছে। ভাবি সায়েব পাড়ার বাড়িতে তাহলে ভিত পুজো করেছিল কেউ। যত দূর মনে পড়ল বিলিতি সায়েবদের এদেশে সম্পত্তি করা ব্রিটিশ সরকার বে-আইনী করে দিয়েছিল এক সময়। এদেশে কলোনি করলে খুব সুখশান্তিতে বাস করা যাবে না, এটা তারা জানত। তাই যে উপনিবেশের ভিত্তি সবচেয়ে গাঢ় হয়, এদেশের লোকদের মনের মাটিতে সেই উপনিবেশের বীজ পুঁতে দিয়ে এই তো মাত্র সেদিন তারা বিদায় নিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই মহা ছুটির দিনের কথা। জয়ন্তী তখন স্বর্গে গেছে, তার শিব আর রূপকে নিয়ে, শিবের স্ত্রী, সুন্দরী অসুখী অ্যাডিও গেছে, তার ছেলে দেব, দেবের বৌ মালা, তাদের সব অশান্তি সব বিতর্ক চুকিয়ে যে যার বিদায় নিয়েছে। তবু চিহ্ন না রেখে কেউ যায় না; সে চিহ্ন কখনও একেবারে নেই হয়েও যায় না, হয়তো বড়জোর চোখে দেখা যায় না। এই সোনার টিকটিকির মতো আড়ালে অপেক্ষা করে থাকে। শুনেছি দেড়শো বছর আগে তৈরি ঐ বাড়ি। তা সে আর এমন কি প্রাচীন? হয়তো ১৮৪০ সালে। মহারানি ভিক্টোরিয়ার যুগে। ৫/৬ পুরুষ আগে। টিকটিকির গায়ের হলদে সোনা চোখের সবুজ পান্না তেমনি আছে।

এ আমার জীবনের ঘটনার পঞ্জিকা নয়, এ আমার মনের খাতা। যখন যেমন মনে হয়েছিল, তার যতটুকু মনে আছে, তাই লেখার চেষ্টা করেছি, তাতেও ভুলচুক আছে। হয়তো একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। জয়ন্তীর দুই ছেলে শিব বড় আর তার চাইতে ১৫ মিনিটের ছোট শঙ্কর। শঙ্করের ডাক নাম রূপ। আর শিবের স্ত্রীর ভালো নাম অদিতি, মেমদের কাছে অ্যাডি আর বাড়ির গুরুজনদের কাছে নন্দা। আমি ডেকেছি দিদিমণি। শিবের ছেলে দেব; দেব আমার শ্বশুরমশাই আর আমার শাশুড়ির নাম ছিল মালা।

উড্ স্ট্রীটের বাড়ির মালিকানার কথায় বলেছি তার তেরো জন ওয়ারিশ। সেই তেরো জন ওয়ারিশের আরেকটু পরিচয় দিলে ভালো হয়। ঐ চৌধুরী হাউস, জয়ন্তীর স্বামীদের তিন ভাইয়ের যৌথ সম্পত্তির অংশ ছিল। তিন জনে পৈত্রিক সম্পত্তির তিনটি আলাদা বাড়িতে বাস করতেন। অন্যরা বাঙালি বনেদী স্টাইলে থাকতেন; বিলেত গিয়ে সায়েব বনেছিলেন শিব আর রূপের বাপ, জয়ন্তীর স্বামী, অরূপ চৌধুরী। উড্ স্ট্রীটের বাড়ি কেনার আগে, ঐ পাড়াতেই ভাড়া বাড়িতে চৌধুরী কোম্পানির আপিস ছিল। এ বাড়ি কেনা হয় অরূপের আগ্রহে। আর এতকাল বাদে যখন বিক্রি হয় তখন ঐ তিন ভাইয়ের তেরোজন ওয়ারিশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে জনা পাঁচেক সল্ট লেকে ফ্ল্যাট নিয়েছিল, বাকিরা তার বদলে অনেক টাকা পেয়েছিল। সবাই চৌধুরীও নয়, দৌহিত্র বংশের

দু'ঘরও ছিল।

মাসখানেকের মধ্যে আমরা সল্ট লেকের পুরনো বাসিন্দা বনে গেলাম। এমন কি আমাদের পরে আসা দু'চারজন আমার কাছে পরামর্শ নিতেও আসত। তাদের মধ্যে একজনরা আমাদের কুটুম্ব, ঐ তেরোজনের একজন। এমনি ছাড়াছাড়ি আত্মকেন্দ্রিক জীবন আমাদের, যে কালেভদ্রে পারিবারিক বিয়ে-থায় কি শ্রাদ্ধবাসরে ছাড়া এদের সঙ্গে দেখাই হতো না।

সত্যি সত্যি একদিন সন্ধ্যার মুখে সোমা, রুমা, দিয়া, জয়ের বৌ সোহিনী, আমার দিল্লিবাসিনী দুই দৌহিত্র আর তাদের ১০/১২ বছরের দুটো ছেলে, মঙ্গলের নেত্রাধীনে ছাবড়া আর ট্যাফিকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস দেখতে রওনা হলাম। ওরা গেল পায়ে হেঁটে, নদীর স্রোতের মতো কলকল করতে করতে আর আমি গেলাম মদনের রিকশাতে। এখানে এসে অবধি ও আমার নিত্য বাহন। ছাবড়া কোল থেকে নামল না।

হয়তো এক কিলোমিটার দূরে, চারদিকে টালির চালের ছোট ছোট বাড়ি, টিপকল, বাঁধানো পথঘাট, সব্জি বাগান, আমবাগান, নারকেল গাছ, পেঁপে গাছ, কলা গাছ আর এই সবের মধ্যিখানে খানিকটা খোলা জায়গা, তার দুদিকে দুটি গোলপোস্ট আর মাঝখানে একটা ছেঁড়া সামিয়ানা, তার চারদিকে তিরপল ঘিরে দেওয়াল তোলা। শুনলাম নোনাগাঁয়ের ছেলেরা এখানে খেলাধুলো, কুস্তি, কারাটে করে। ঐখানেই সার্কাসের খাসা জায়গা হয়েছে। কাঠের বেঞ্চিতে, মাটিতে শতরঞ্জি পেতে, দর্শকদের স্থান হয়েছে। টিকিট ফিকিটের বালাই নেই। খেলার শেষে একটা এলুমিনিয়ামের বাটিতে চাঁদা তোলা হল। যেমন কথা ছিল সবাই ১ টাকা করে দিল। ৫ বছরের কমরা ফ্রি।

কি আর বলব, এই ৮২ বছর বয়স হল, সায়েবদের আমলের খাস বিলেত থেকে আসা চমৎকার সব সার্কাস দেখেছিলাম, কিন্তু

বিনা আড়ম্বরের এরা যা দেখাল, তার জুড়ি নেই। মিঃ চিম্প দেখলাম কালো পেন্টেলুন, খাকি শার্ট আর হাতে চুরুট নিয়ে, রিং-এর এক পাশে বসে আছেন। তিনি আঙুল দেখিয়ে যে চমৎকার খেল পরিচালনা করলেন, তা আমার স্বপ্নের বাইরে ছিল। একেকবার মনে হচ্ছিল হয়তো সত্যি শিম্পাজি নন্, কেউ অমন সেজেছে। আমাদের পাশে সঞ্জয় বলে একটি সুন্দর চেহারার ইয়ংম্যান বসেছিল, সে নাকি অনেকবার ওদের মহড়া দেখে গেছে, উনি যে বনমানুষ তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি শিক্ষানবিশরা বেশি ভুলভাল করলে, রেগে মেগে কোট পেন্টেলুন খুলে ফেলে এমনি লাফঝাঁপ শুরু করে দেন যে ওঁর জাতি বর্ণ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। এ কথা শুনে আমাদের দলের ছোটরা এমনি হাসাহসি শুরু করল যে মিঃ চিম্প আমাদের দিকে ফিরে নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ করতে বললেন। লজ্জায় আমাদের মুখ লাল।

জাদুর মতো সব খেল দেখাল। দুটি বড় সাইজের ছাগল, দুটি ঘোড়া, একটা ভালুক, আর জনা দশেক নোনাগাঁয়ের ছেলে, তারা সবাই মিলে অসম্ভবকে সম্ভব করে দিল। একজন মহা তিড়িং বিড়িং বেয়াদপি করছিল। তাকে ঘন্টা খানেক মাটিতে পুঁতে রাখল, খেলার শেষে খুঁড়ে বের করতেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ভেংচি কেটে, বক দেখিয়ে, আত্মসম্মান উদ্ধার করে ছেঁড়া পর্দার আড়ালে চলে গেল। বুড়ো মাস্টারবাবু দুটো ময়লা রুমালে গিঁট বেঁধে ন্যাকড়ার পুতুল বানিয়ে আমাদের চোখের সামনে তাদের গায়ে ফুঁ দিতেই, তারা জ্যান্ত হয়ে মাস্টারবাবুর হাত থেকে লাফিয়ে নেমে কত রকম যে নাচ দেখাল সে আর কি বলব। পরে তাঁকে ঘুঁসি দেখাতে তিনিও রেগেমেগে তাদের ধরে, ফুঁ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, গিঁট খুলে রুমাল বানিয়ে, পকেটে পুরে রাখলেন! সবাই তাজ্জব বনে গেলাম। আমার মনে পড়ে গেল জিপ্সিদের আদি নিবাস ছিল নাকি আমাদের

দেশে। কতরকম জাদুবিদ্যার গল্প শোনা যায়। আমার স্বামী বলতেন তাঁর চোখের সামনে একজন পথ থেকে ধরে আনা জাদুকর, আমের আঁটি থেকে মস্ত আমগাছে ফল ফলিয়ে, তাঁদের খাইয়ে ছেড়ে ছিল। সব চাইতে আশ্চর্য কথা, এ সব ঘটেছিল আমাদের উড্ স্ট্রীটের বাড়ির গাড়ি বারান্দায় তলায়। এখন আর কেউ ও-সবের গল্পও করে না। সবাই টিভিতে বিলিতি নাচগানের হিন্দি নকল দেখেই মুগ্ধ। ফিরে দেখি খেলা শেষ হয়ে গেছে। সকলে উঠে পড়েছে। বাইরে এসে সঞ্জয় ছেলেটি আমাকে টিপ করে একটা প্রণাম করে হেসে বলল, 'দিদিমণি আমাকে চিনতে পারেননি মনে হচ্ছে? আমি বাদুড়বাগানের চৌধুরীদের বাড়ির ছেলে।' আমি বললাম, 'অর্থাৎ আমাদের কুটুম্ব এবং ১৩ ওয়ারিশের একজন। তোমাদের বাড়িতে নানা ব্যাপারে অনেকবার গেছি তুমি তখন ছোট ছিলে। এসো আমাদের বাড়িতে। আজকাল সবাইকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

পরদিনই এসেছিল। ভবে অন্য ব্যাপারে। ঐ সার্কাস খেলার কথা কেউ পুলিসের কানে তুলেছিল। তাই নিয়ে এনকোয়ারি হচ্ছিল, কেন অনুমতিপত্র নেওয়া হয়নি। সার্কাস দেখাতে হলে লাইসেন্স নিতে হয়। বিশেষ করে টিকিট বিক্রি করলে। পুলিস থেকে কমবয়সী এক অফিসারও এসেছিল। বলল, 'আপনি যা বলবেন, তাই আমরা মেনে নেব। কারও ওপর অন্যায় করাও উচিত নয়, কিন্তু বে-আইনী কাজেরও প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।' বুঝিয়ে বলেছিলাম এটা পাড়ার মধ্যে অ্যামেচার শো বৈ তো নয়, তবে গরীব মানুষ জন্তু জানোয়ার পুষতে খরচ লাগে, তাই চাঁদা তুলেছিল। কারও ওপর জোরজার করেনি। শেষ পর্যন্ত ঐ অফিসারের পৃষ্ঠপোষকতায় লাইসেন্স ইত্যাদি সব হয়ে গেল। নোনাগাঁয়ের লোকরা যারা কারও চাকরি করতে রাজি নয়, তারা নিজেদের সার্কাস পার্টি গড়ল।

এইভাবে একটু একটু করে আমরা সল্ট লেক আর নোনাগাঁয়ের মতো আশেরপাশের গ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে যেতে লাগলাম। মঙ্গলকে পায় কে! ওদের পাড়ার যত মজার খবর সে আমাদের কাছে সরবরাহ করত। দুঃখের কাহিনীও। এমন কি কবে শুঁটকি মাছ শুকোবার জন্য পাশের পাড়ার বোষ্টমরা প্রথমে পুলিসের ও পরে মারের ভয় দেখিয়েছিল। দ্বিতীয় পন্থার হুমকিটা খুবই কার্যকরী হয়েছিল, বিশেষ করে যেহেতু ততদিনে শুঁটকিগুলো তৈরি হয়ে গেছিল। 'কি ভালো শুঁটকি। ওর কাছে তাজা মাছ লাগে! তাজা খেলে মনে হয় একটা জ্যান্ত জানোয়ার মেরে খাচ্ছি আর শুঁটকি খেলে মনে হয় আচার খাচ্ছি। আমার মায়ের তৈরি এট্টু এনে দোব, দিদিমণি? সঞ্জয়দাদাদের বাড়িতে দিয়েছি, ওঁর কাকিরা খুব ভালোবাসেন। আমার মাকে শাড়ি দিয়েছেন। তবে সঞ্জয়দাদারা খায় না, বলে নাকি বিশ্রী গন্ধ! ও দিকে টিনের মাছ খায়, তার গন্ধ তো আরও খারাপ!'

এইভাবে সকলের ঘরের খবর সকলের বাড়িতে সরবরাহ হতো। সবাইকে বুঝেসুঝে চলতে হতো। মাঝে মাঝে বুড়ো আব্বাসের কথা মনে পড়ে। সে সারাজীবন আমাদের বাড়িতে কাজ করল, অথচ মারা গেলে কেউ ওর আপনজনের নাম ঠিকানা পর্যন্ত বলতে পারল না। ওর প্রাপ্য টাকাগুলো, এমন কি তার চেয়েও বেশি একটা অনাথ আশ্রম পেল। হয়তো ভালোই হল। বেঁচে থাকতে তো কেউ খোঁজ নেয়নি। ঐ যে আমাদের শরিকের বাড়ির মেয়ে, আমরা আসার পরেই একদিন এসে সাত গুষ্টির খোঁজখবর নিয়ে কাঁচা পোস্তর অম্বল শিখবে বলে গেছিল, সে এক দিন এসে পোস্তর অম্বল সত্যি শিখে গেল। আমোদিনীই শিখিয়ে দিয়েছিল। কাঁচা পোস্ত বাটা, কাঁচা আম বাটা, কিম্বা একটু তেঁতুল গুলে বিচি বাদ দিয়ে কাঁচা লংকা বাটা, পছন্দ মতো চিনি, নুন, কাঁচা আমের সময় না হলে একটু ধনে পাতা বাটা। এই তো নিয়ম, কিন্তু খেতে অমৃত।

ঐ মেয়ের ডাক নাম সুমি, ভারী নিরহংকার মিশুকে মেয়ে। এত বেশি নিরহংকার যে দেখতে দেখতে আমোদিনীর সঙ্গে ভারী দহরম মহরম হয়ে গেল। দুপুরে আমি যখন বিশ্রাম করি, বারান্দা থেকে ওদের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পাই। ওর হাতে সর্বদা একটা উল-বোনা, নয়তো ক্রুশ-কাঁটা আর লেস থাকে। কি সূক্ষ্ম হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হই। সুমিও বাড়ির বৌ; দেখতে ভালো, কাজের মেয়ে, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিও পাস করেনি। ভাবি তাতে কিছু এসে যায় না। নিজের ছেলেমেয়ের যত্ন করে, ঘরের কাজকর্ম সেরে, দুপুরে না ঘুমিয়ে একটু এ-বাড়ি ও-বাড়ি যায়। অনেক সময় কৌটো করে একটু ভাজা মশলা, কি মিষ্টি আচার, কি ঘরে করা জেলি দিয়ে যায়। কারও বড় একটা নিন্দা করে না, কিন্তু সকলের হাঁড়ির খবর সরবরাহ করে। তাতে আমোদিনীর একঘেঁয়ে জীবনে রোমাঞ্চের রং লাগে।

প্রায় ৬০ বছর উড্ স্ট্রীটে বাস করে, ভুলেই যাচ্ছিলাম পাড়া বেড়ানো কাকে বলে। কত সময় বলেছি, 'ঐ রকম শুধু মুখে চলে যেও না মা, একেবারে চা জল খাবার খেয়ে যেও। নাতনিদেরও ফেরার সময় হয়ে এল। তাদের সঙ্গেও আলাপ করলে তোমার ভালো লাগবে।' এ-কথা বলাতে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ওর মুখটা ঝড়ের মতো কালো হয়ে গেছে। তবে সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই স্বাভাবিক গলায় বলল, 'না, দিদিমণি, ছেলেমেয়ে ইস্কুল থেকে এক্ষুণি ফিরবে। আমার থাকা দরকার। শাশুড়ির একটু ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক আছে, জামাটামা ছাড়িয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হই।'

ভাবি বেঁচে থাকলে কত দেখতে পাওয়া যায়। এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা আজও বুঝে উঠলাম না। তবে ঐ দিদিশাশুড়ির বলা হাপ-বেম্ম আবহাওয়াটার জন্যেই বোধ হয় আমি নিজে বেঁচে গেছি।

পরদিন সকালে আমোদিনী রোদে পিঠ দিয়ে বসে,'বাগানবাড়ি'

বড়ি দিতে দিতে বলল, 'তুমি তো কোনও মন্দ কথা শুনতে চাও না, মা। এমন কি যা নাকের ডগায় ঘটে যাচ্ছে, তাও সব সময় দেখতে পাও না, তাই শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়।' আমি ছড়ার পাশে প্যাঁচা আঁকা বন্ধ করে, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমোদিনী বলল, 'চোখ থাকলেও যে দেখতে পায় না, তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়।' বললাম, 'বলেই ফেল্, কি বলতে চাস্।' 'ঐ সঞ্জয় ছোকরাই বা এ বাড়িতে এত ঘনঘন আসে কেন?' 'আত্মীয় হয়, কাছেই থাকে, তা আসবে নাই বা কেন?' 'আত্মীয় বলেই তো যত সমস্যা।'

বিরক্ত হয়ে কাজকর্ম তুলে ওর কথা শুনতে বসলাম। কথার মর্ম হল ঐ বৌ বলে গেছে সঞ্জয় ছোকরার আমাদের বাড়িতে এত ঘন ঘন আসা নিয়ে ওদের বাড়িতে কথা উঠেছে। শুনেই চটে গিয়ে বললাম, 'তাই কি? সঞ্জয়ের সঙ্গে ওদের কি? দু-জনাই আমাদের কুটুম্ব এর বেশি তো নয়। তুই ও সবে নাক গলাবি না, আমোদিনী।' আমোদিনী বলল, 'আমার কথায় কি এসে যায়, মা? দয়া করে বাড়িতে ঠাঁই দেছ তাই আছি। যেটুকু পারি করি। যে দিন দূর করে দেবে, যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব।' বলে কেঁদেকেটে এক সা করল, যেন কত অন্যায় কথা বলেছি। খালি বললাম, 'তোকে দূর করে দিলে যদি আমার রাজ্যলাভ হতো, তাহলে যদি বা লোভ হতে পারত, এমনিতে তো অসুবিধা ছাড়া কিছু হবে না। তবু সঞ্জয় কি করে না করে, তাতে ওদের কি, সেটা শুনি।' শেষটা বলে কি না ঐ সুমির বড় জা-র বড় মেয়ের সঙ্গে ঐ ছেলের ওরা সম্বন্ধ করতে চায়। বললাম, 'করুক না।' 'ছেলে রাজি হচ্ছে না।'

আগে যেমন আমিই ছিলাম বাড়ির মাথা; সবাই সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরত; আমায় স্বামী চোখ বুজলেই আমি ছুটি নিয়েছিলাম আর বাড়ি সুদ্ধু সকলের চির নাবালকত্ব ঘুচে গেছিল। আমার দিদিশাশুড়ির ঐ

এক ছেলে দেব, আমার দেবতুল্য শ্বশুর, যিনি ছোটবেলায় গ্যাম্মা বলতে অজ্ঞান! তাঁর এক ছেলে বাসব, অবিকল তাঁর মতো চেহারা, তাঁর মতো উদার মন, কিন্তু এতটুকু সাহেবিয়ানা নেই। তিনি ছিলেন গান্ধী ভক্ত আর সংস্কৃত ও বাংলায় পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। আমার সঙ্গে দেখা হল যখন আমি এম্-এ ক্লাসের ছাত্রী আর উনি সব চাইতে কম-বয়সী ডক্টরেট পাওয়া অধ্যাপক। ওঁর ছোট ভাই সূর্য আমার সঙ্গে পড়ত। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে পড়াশুনো ছেড়ে, কোথায় কোন সন্ত্রাসবাদীদের দলে জুটে, শেষ পর্যন্ত জেলে জেলে দীর্ঘকাল কাটিয়ে যখন অনেক বছর পরে ছাড়া পেল, দেখলাম আমার সেই প্রসন্নবদন পরিহাসপ্রিয় সুদর্শন সহপাঠী অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কষ্ট ভোগ করে নয়, আশা-ভঙ্গে। যে-দেশের জন্য সূর্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, এ সে দেশ নয়। কেমন যেন অন্তরে অন্তরে ভেঙে পড়েছিল সে। বাড়ির অবস্থা ভালো, কোনও অভাব নেই, কোনও সাংসারিক দায় নেই, তবু সে চোখের সামনে শুকিয়ে মরে গেল। এত গভীর দুঃখ আমি জীবনে পাইনি। মাত্র ৩২ বছর বয়স হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভ করতে আমাদের আরও ৯ বছর লেগেছিল। তবে এমন স্বাধীনতায় সে সুখী হতো না, তা আমি বেশ জানি। আমার হাত দুখানি ধরে কি যেন বলার চেষ্টা করেছিল, মৃত্যু এসে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম সে বাসবকে ডেকে আমাকে তার একমাত্র ওয়ারিশ করে গেছিল। নাতনিরা বলেছিল, 'তুমি তো বড়লোক, পুরনো বাড়িতে কি খুঁজে বেড়াও?' সূর্যকে আর কোথায় পাব এ জগতে, আমার মনের মধ্যে ছাড়া? ওর মা মালা চৌধুরী বড় অহংকারী ছিলেন; রাজনীতিকে ঘৃণা করতেন। ছোট ছেলের মুখ দেখতেন না। বলতেন কুলে কালি দিয়েছে। গান্ধীজি সম্বন্ধে কখনও কিছু বলতেন না। আমার সঙ্গে বড়ই ভালো ব্যবহার করেছিলেন। আমার মনে বড়ই ভয় ছিল, কারণ এ বংশের কেউ নিজেদের বিয়ে নিজেরা ঠিক

করে না। মনে আছে নিজের গলার বিছে হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বাবার মতো উদার মানুষও কিন্তু খুশি হননি; বলেছিলেন, 'ও বংশের কোনও বৌ সুখী হয় না; এ কথা কে না জানে? যদি যাও তো বাপের বাড়ির মায়া কাটিয়ে যেও।' তবু বাসব একবার চেষ্টা করেছিলেন, খুব একটা কৃতকার্য হননি। কারও কারও হৃদয়ের নীচে একটা চির তুষারের দেশ থাকে, তাকে গলানো যায় না।

আমি সারাজীবন নিয়মিত যাওয়া-আসা করেছি, থাকিনি কখনও। ভাইবোনেরা এসেছে, যখনি ডেকেছি। এখন তারা সকলে বিদায় নিয়েছে যার যখন সময় হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। আমরা কলকাতার মেমদের সঙ্গে মিলে যেসব লেডিজ কমিটি ইত্যাদি করে, গ্রামের নিরক্ষর মেয়েদের মধ্যে সাহায্য ও সদুপদেশ বিতরণ করার চেষ্টা করতাম, তার যুগও চুকেবুকে গেছে। জলের ওপর আঁচড় কাটার মতো কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। হেনকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে দুনিয়ার সব পুরনো ভিৎগুলো আলাদা করে দিয়ে, প্রচণ্ড আঘাত হেনে আমাদের দেশটাকে চার বছরে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে দিল।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এক কোপে অন্তঃপুরের দেয়াল ভেঙে জাতিভেদকে মাড়িয়ে ভেঙে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে, দলে দলে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের অসহায় অনাথ করে পথে বের করে দিল, সর্বনাশের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের মুক্তি দিল। বলা বাহুল্য আমার মতো আরও শত শত সুখী বাঙালি মেয়েরা তাদের জন্য যেটুকু পারি সেটুকু করার চেষ্টা করেছিলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রথমটা হতাশায় ডুবে থাকলেও, যেই তারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুখের আস্বাদ পেল, আর ফিরে তাকাল না। আমার এই একটা জীবনে এ-দেশের মেয়েরা পৃথিবীর যে কোনও স্বাধীন মেয়েদের পাশে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার পেল।

তার চেয়েও বেশি হল। উড্ স্ট্রীটের ঐ চৌধুরী হাউসের বাসিন্দাদের মতো মানুষরাই হোক, কিম্বা তাঁদের গোঁড়া হিন্দু শরিকরাই হন, সকলকে স্বরচিত স্বর্গ থেকে নেমে এসে, সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবার অধিকার নিতে হল। অমুক অমুক জায়গার রাজা মহারাজাদের প্রাপ্য সম্মান ছাঁটাই হল আর সত্যি কথা বলতে কি তাঁরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। পদ-মর্যাদা বড় বালাই। মানুষকে মানুষ হতে দেয় না। মনে পড়ল আমার দেবতুল্য শ্বশুরমশাই বলতেন, এ বাড়ি থেকে কোনও প্রার্থী যেন খালি হাতে ফিরে না যায়। কিন্তু যাকে যা দেবার সরকার মশাই হাতে করে দেবেন। মেয়েরা দেখা দেবে না। আহা, দেবু চৌধুরীর স্ত্রী মালা চৌধুরীকে লোকে অহংকারী বলত, কেউবা খোসামোদ করত, কেউবা এড়িয়ে চলত। একটা বড় নিউ ইয়ার পার্টিতে গিয়ে উৎসব ক্ষেত্রেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, আর কখনও সুস্থ হলেন না। তখন তাঁর ৫৫ বছর বয়স। আরও ১৫ বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বেঁচে ছিলেন। সেই গোয়ানিজ মেম আর আমোদিনী কি সেবাটাই না করেছিল। ভারী রূপ ছিল মালার। নিয়ে গেল যখন যেন এক ছড়া শুকনো ফুলের মালা। তার এক বছর আগে আমার শ্বশুরও স্বর্গে গেছিলেন। মালাকে কিছু বলা হয়নি। তবু মনে হয় সব বুঝেছিলেন। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল দেখেছি।

আমার খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, একদিন আমাদের পাহাড়ি শহর আলোর মালা পরেছিল। মনে হয় ১৯১১ কি ঐরকম হবে। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে নতুন রাজা বসবেন বলে গোটা শহর আলোর মালা পরেছিল। সম্ভবতঃ পঞ্চম জর্জ নতুন রাজা হলেন। এখন ভেবে আশ্চর্য হই কিসের মোহে এত আনন্দ করেছিল সবাই। তার মাত্র ক-বছর আগে কানাই দত্ত ফাঁসি গেছিল। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ঝাড়েমূলে উৎপাটন করা গেছে ভেবে কি? নিশ্চিন্ত আরামে থাকার মতো আর কিছু জনসাধারণ চায় না বলেই কি? মোট কথা কোনও অশান্তিকর কথা যদি শুনেও থাকি, তার মানে বুঝিনি। পরম নিশ্চিন্তে বাপের শাসনে, মায়ের আদরে শৈশব কেটেছিল। কোনও দুঃখ-বিপদের সম্ভাবনার কথাও মনে আসেনি কখনও। এলেও মা আছেন, আবার ভাবনা কিসের?

জয়ন্তী এক জায়গায় লিখেছে, 'আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। শিব আর রূপ আমায় মনের কোনও গোপন কোণেও এতটুকু অন্ধকার থাকতে দেয়নি। খালি বলি ভগবান, "আমি যেন ওদের যোগ্য মা হতে পারি।" এ জগতে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না। কোনও বাইরের জিনিস দিয়ে মনের সুখ হয় না। বড় জোর বাইরের আরাম হয়। তাতে সুখ নেই। তবু বিধাতাকে বলি, "আমাকে বল দিও, যাতে ওদের অধিকার করতে চেষ্টা না করি। এ দুনিয়াতে কেউ কারও নয়। ওরা আমার দুকোল জুড়ে, সমস্ত হৃদয়

মন জুড়ে আছে। আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। তবু ওদের ছেড়ে দেবার বল দিও আমাকে, ভগবান"।'

আমার দিদিশাশুড়ি বলতেন, 'কি পাষানী, হৃদয়হীনা ছিল, সে আর কি বলব তোকে! সায়েবদের মতো। ছেলে দুটোকে ছোটবেলায় কি করত তা তো আর চোখে দেখিনি। তবে সায়েব টিউটর ছিল, বিলেতে কলেজে পড়েছিল। তার কি ফল হল? একটা আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিল আর অন্যটা সাধু হয়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয় ওদের মায়ের বুক ফেটে গেছিল। কিন্তু টের পাবে কার সাধ্যি! জানিস্, শুনেছি ছোটবেলায় ওরা যদি আছাড় খেত, কোলে নিত না। দূরে দাঁড়িয়ে বলত, "ওঠো তো দেখি কেমন পারো।" আর ও-দুটোও তেমনি, অমনি উঠে পড়ে খলখল করে ফোক্‌লা মুখের দুটো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে নড়বড় করে ছুটতে ছুটতে ঐ পাষানীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এ আমার চোখে দেখা না হলেও যারা দেখেছিল তাদের কাছেই শোনা। আর তবু ঐ শিববাবুর ছেলেটাও গ্যাম্মা বলতে অজ্ঞান। তুই আর জয়ন্তীর গুণ গাস্‌নে, নাতবৌ পড়তিস্ ওর পাল্লায়, দেখতিস্ তোর ঐ এম্-এ পাস্ করা, গল্পের বইতে ছবি এঁকে নাম করা অহংকারটি কেমন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেত, হ্যাঁ!' এই বলে অভ্যাস মতো টপ করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এ-সব কথা আমাদের উড্ স্ট্রীটের বাড়ির একতলার দক্ষিণের বারান্দাতেই সাধারণত হতো। দিদিশাশুড়ি তাঁর চাকা-লাগানো রবার-টায়ার দেওয়া আরামকেদারার মতো হুইলচেয়ারে নিঃশব্দে আমার কাছে এসে থামতেন। শিববাবুর ছেলে, তাঁর গ্যাম্মার আদরের নাতি, অর্থাৎ আমার সায়েবি মেজাজের কিন্তু রবীন্দ্র-ভক্ত, উদার হৃদয় শ্বশুরমশাইও তাঁর কাগজপত্র নিয়ে বসতেন। সরকারমশাই আসা-যাওয়া করতেন। মায়ের অনর্গল কথা শুনে কখনও মুচকি হাসতেন, কখনও মুখটা কেমন কোমল হয়ে উঠত।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমারও হাসি পেত। তাঁর পুত্রটির সামনে দিদিশাশুড়ি ভুলেও জয়ন্তীর প্রসঙ্গ মুখে আনতেন না।

একদিন বল। নেই কওয়া নেই, দিদিশাশুড়ি আধঘণ্টা জয়ন্তীর বিষয়ে নানা কটু মন্তব্য করার পর, হঠাৎ বললেন, 'কি যে বলি না বলি মনের দুঃখে, তার ঠিক নেই। কিচ্ছু বিশ্বাস করিস্‌নে রে নাত্‌বৌ। ও সব পেল, আর আমি কিচ্ছুই পেলাম না, তাই বুকটা হিংসায় জ্বলে যায় রে আর মুখ দিয়ে বিষ ঝরাই। বিষয় আশয় টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি ভোগ-সুখ কিছুই চায়নি সে। তবু কিসের জোরে সবার মন হাতের মুঠোর মধ্যে করে রাখত ভেবে পাইনে। এমন কি ঐ ফেরারি স্বামীটি পর্যন্ত ফিরে এসে, ওর কোলে মাথা রেখে মলো। ভগবান মঙ্গলময়।' এই বলে দিদিশাশুড়ি সেই যে চোখ বুজলেন আর খুললেন না। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

কত কথাই যে ভাবি আমাদের সল্ট লেকের এই ফ্ল্যাটে বসে। হয়তো সত্যিই কিছু শেষ হয়ে যায় না; কালের চক্রে খালি ঘুরে মরে। অনন্তকাল ঘুরতে ইচ্ছাও করে না। উড্ স্ট্রীটের ফটকের নাম ফলকের পিছনে যে ছোট্ট সোনার দেবমূর্তিটি পাওয়া গেছিল, সে যে জয়ন্তীর হাতে রাখা, তাতে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। মুখে যে যাই বলি, সবাই বড়ই অসহায় আমরা, কেবলই অবলম্বন হাতড়ে বেড়াই। মনে আছে সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে কনভেন্টের বড় গির্জায় প্রার্থনাসভা হতো যারা প্রাণ হাতে করে যুদ্ধে গেছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য। আমার ৬ বছর বয়স; মা-তে আর ভগবানে অগাধ বিশ্বাস; প্রথমটাতে কিঞ্চিৎ বেশিই, তবে দ্বিতীয়টাতেও কিছু কম নয়। ভাবতাম একে ঐ সৈন্য-সামন্ত, বন্দুক-কামান, গোলাগুলি, বোমা, তার উপর আবার ভগবানকে ডেকে আনা হচ্ছে, জর্মানরা পারবে কেন! হেরে ভূত হয়ে যাবে।

জয়ন্তী যখন শিব আর রূপকে মানুষ করছে, তখনই উত্তর

কলকাতায় বেথুন কলেজে মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁদের অনেকেই শুনতাম মহারানি ভিক্টোরিয়ার ভারী ভক্ত। বিলেতেও তখন অভিজাত পরিবারের মেয়েরা ভালো ভালো স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে ফরাসি দেশে কি সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে ফিনিশিং নিত। তারা তো আর খেটে খাবে না। আবার অন্যদিকে রান্নাঘরে সেঁদিয়ে মুখের রংও ঝল্‌সাবে না, হাতের কোমলতাও নষ্ট করবে না। শেষটা নখ ভেঙে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হোক আর কি! তবে মিহি কাপড়ে রেশমি সুতোর নক্সা তোলা অন্য কথা। কেমন করে ঘর সাজাতে ও নিজে সাজতে হয়, তাও জানা দরকার। বড় বড় পার্টি দিতে হলে কি কি নিয়ম পালন না করলেই নয় আর কাদের সঙ্গে মেশা যায় এবং কাদের সঙ্গে যায় না, কাকে পার্টিতে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শিখতে হতো।

এ সব আমার জানবার কথা নয়, তবে জয়ন্তীর ডাইরিতে নানান উপভোগ্য মন্তব্যও আছে। আর আমার মা-মাসির কাছে শোনা তাঁদের মা-দিদিমাদের সময়কার যাকে বলে 'ফ্লেজলিং' বঙ্গনারী সমাজের বর্ণনাও শুনেছি। তাঁদের আয়াদের বাংলা বলা বারণ ছিল। হিন্দি কিম্বা বিচিত্র এক ইংরিজি বলতে হতো। ভালো ইংরিজি আর কে শেখাবে। আমার নিজেরই ছোটবেলার কথায় মনে আছে, এক ফ্যাশানেব্‌ল্ মাসির বাড়ির আয়া একদিন বলেছিল, 'আর কেয়া বলে—গা দিদি, এই হিন্দি বাৎ বলতে বলতে জান নিকলে যায় রে বাবা!' আমরা বললাম, 'তাহলে বলিস্ কেন?' সে জিব কেটে বলল, 'অ মা! কিয়া বলতা! আরে নোকরি ছুট্ যানে সে তুই কি ঘরে ঠাঁই দিবি!' আরেকটু বেটার ক্লাসের বেয়ারারা একরকম ইংরিজি বলত। তাদের একজন ফ্লাওয়ারি খাওয়াবে বলে লোভ দেখিয়ে উৎকৃষ্ট ফুলুরি খাইয়েছিল। তবে যে নামেই ডাকা যাক, ভালো জিনিস সর্বদা ভালো জিনিস।

সে-সব কথা ভেবে এখন হাসি পায়। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সায়েবরা দেশে ফিরে গিয়ে সুখেই আছে। সত্যিই পৃথিবীর মধ্যে ওরা হয়তো সব চাইতে সুখীদের অন্যতম। সাম্রাজ্য চালানোর হাড়জ্বলুনি ব্যামো সেরে গেছে। সুখের চাইতে সোয়াস্তি যে ঢের ভালো তা মজ্জায় মজ্জায় বুঝেছে। পৃথিবীর সব চাইতে সুশাসিত দেশ ওদের। আমাদের জন্যে ওরা দিব্যি সুন্দর পথঘাট, ঘরবাড়ি, ইস্কুল কলেজ, পয়োঃপ্রণালী, যানবাহন আর উদার এক শাসন পদ্ধতি এবং বলিষ্ঠ একটি ভাষা উপহার দিয়ে গেছিল। সে-সব যদি রাখতে না পারি, সেটা তাদের দোষ নয়। জয়ন্তীর স্বামী কি দেখে সায়েবভুক্ত হয়েছিলেন তা বুঝতে পারি। জয়ন্তীও কেন সেই আদর্শ রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল তাও আমি মনে মনে বুঝতে পারি। ওঁদের স্বপ্ন ছিল ও-দেশের আদর্শ এখানকার মাটিতে রোপন করবেন। আমাদের দেশটা যাতে শুধু মহান অতীতের গর্বে বুঁদ হয়ে না থেকে, আধুনিক জগতেও একটু পা রাখার জায়গা পায়। শিব আর রূপ যতই সায়েব টিউটরের কাছে পড়ুক আর বিলিতি ডিগ্রি আনুক, বেদপড়া বামুনের বেদপড়া মেয়ে জয়ন্তী মেমসাহেব, দুই ছেলেকে নিজে বাংলা সংস্কৃত পড়াত।

দিদিশাশুড়ি অবিশ্যি আক্ষেপ করে বলতেন, 'ওতেই ওঁদের কাল হয়েছিল। গুছনো সংসারেও মন উঠত না। একজন হলেন রবিঠাকুরের চেলা—জানিস্ শান্তিনিকেতনে গোটাকতক খ্যাপাটে সত্যিকার সায়েবকেও খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি! আর একজন হলেন রামকিষ্টান, ন্যাড়ামাথা, গেরুয়া বস্ত্র—কিন্তু মিথ্যা বলা মহা পাপ রে নাতবৌ—গা থেকে আলো বেরুত আর বলেছিই তো দেখলে রাগে গা জ্বলত। পাশের বাড়ির মেমসায়েব ওকে 'পেট্ গড্‌ম্যান' বলে সে যে কত রকম টিট্‌কিরি দিত সে যদি শুনতিস্—তবু কি আর বলব তোকে, সম্পর্কে সে ছোট হতো, কিন্তু আমার মনের একটা দিক

তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ত। শিববাবুও চলে গেলেন, সে-ও আর এল না। আমি একলা পড়ে থাকলাম।' বলে কেঁদেকেটে একসা!

শেষ পর্যন্ত আমার শ্বশুরমশাই নরম গলায় বললেন, 'তবে কি তোমার ছেলে আর মেয়ে দুটো কেউ নয়?' অমনি এক গাল হাসি! শ্বশুরমশাই বললেন, 'দেখ মা, আমারই বয়স ৫৯, তোমার ৮৬, বাবারা থাকলে তাঁদের হতো ৯৩। তাছাড়া বাবা গেলে পরেই কাকামণি আরও ৩/৪ জন সাধুর সঙ্গে হিমালয় চলে গেছিলেন। বলে গেছিলেন আর ফিরবেন না।' এ-কথা শুনে দিদিশাশুড়ি পদ্মফুলের মতো হাত দুখানি কপালে ঠেকিয়ে শান্ত হয়ে শুয়ে বলছিলেন, 'একটু ছানার পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে।' মনে হল, আহা প্রকৃতি-দেবীর কত দয়া! ছানার পায়েস দিয়ে ব্যর্থতার দুঃখ ভোলান। তবে অমন ছেলেমেয়ে যার, তার আবার ব্যর্থতা কোথায়?

আমার স্বামীও আমার চাইতে ৮ বছরের বড় ছিলেন। নিজেদের ঠিক করা বিয়ে, তখনও গুরুজনরা ভালো চক্ষে দেখতেন না। এদিকে কিন্তু দেশে গান্ধীযুগ শুরু হয়ে গেছে। গান্ধীজি না জন্মালে হয়তো সমস্ত দেশটা অমন গা-ছাড়া দিয়ে জেগে উঠত না। একদল দুঃসাহসিকা অমনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন! তবু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় অবিবাহিতাদের কথা বাদ দিলে, স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকারে তিনি কি বিশ্বাস করতেন? একটা ঘটনার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। শুনেছি অনেক দিনের কথা। গান্ধীজির আশ্রমে কয়েকজন বিদেশি অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের জন্য সাহেবি বাথরুম ছিল না। কোনও স্যানিটারি ব্যবস্থাই ছিল না। রাতে গান্ধী স্ত্রীকে বললেন, 'সবাই কাজে ব্যস্ত আছে। তুমিই বরং ময়লার বালতিটা মাথায় করে নিয়ে ফেলে দিয়ে এসো।' কস্তুরী বাঈয়ের চোখ ফেটে জল এসেছিল। তবু কোনও প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে

স্বামীর আজ্ঞা পালন করেছিলেন। তখনকার সমাজে এ এক অভিনব ঘটনা। এক মেমের মুখে শুনেছিলাম স্কটল্যান্ডের কোনও গ্রামে ৫০ বছর আগে পর্যন্ত স্যানিটারি ব্যবস্থা পৌঁছয়নি। প্রত্যেক বাড়ির কর্তা রাতে ঐ সাফাই ফেলার কাজটি করতেন। কেউ কিছু মনে করতেন না। ভেবে দেখলে মনে হয় কাজকে সম্মান করতে এঁরাই জানেন। কস্তুরী বাঈ না গেলে, গান্ধীজি নিজেই যেতেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তখনকার জীবনের এক পিঠ উড্ স্ট্রীটে দেখেছি, এ হল আরেকটা ফলক। কিছু কম উজ্জ্বল নয়।

মোট কথা আমি যখন ছেলেদের সঙ্গে এম্-এ পড়তে গেছিলাম, কলেজ স্ট্রীটে সর্বসাকুল্যে জনা ২০ মেয়েও এম্-এ পড়ত কিনা সন্দেহ। আমার এক শিক্ষিতা বান্ধবীর মা বলেছিলেন ওতে মেয়েদের নারীসুলভ কোমলতা নষ্ট হয়। নিজের পক্ষ নিয়ে লড়তে হলে, কোমলতা একটা বিলাসিতা এবং বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের শিক্ষিত এবং অগ্রসরবান হাফ-ব্রাহ্ম পরিবারে আমিই প্রথম এম্-এ পড়লাম। আমার স্বামী বিলেত থেকে ফিরে সাময়িক অধ্যাপকের পদে ছিলেন। কি জানি কেন আমাকে পছন্দ হয়ে গেছিল এবং শেষ পর্যন্ত রেজিস্টারি করে বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরমশাই মহাখুশি হয়ে আমাকে ঘরে তুলে বললেন, 'বাসব যদি খারাপ ব্যবহার করে, টেল্ মি।'

পুরনো কথা থেকে মনটাকে সল্ট লেকে ফিরিয়ে আনতে হয়। ঐ সঞ্জয় বলে সুন্দর ছেলেটি আমাকে একা পেয়ে একদিন বলে বসল, 'দিদিমণি, আমি যদি সোমাকে বিয়ে করি, তুমিও কি রেগে যাবে?' আমি আকাশ থেকে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আমিও, আর কে-কেও?' 'বাড়িতে সবাই কথা বন্ধ করেছেন। তাহলে নাকি কুটুমবাড়িতে মুখ দেখাতে পারবেন না। এদিকে সোমার মা ঘরে দোর দিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তাই কি? অন্য বাধাও আছে নাকি?' 'শরিক যে।' 'শরিক আবার কি? আইন মতে তো তোদের

চেয়েও নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও বিয়ে হতে পারে।' 'বাপের বাড়িতে আর আমার স্থান হবে না।' আমি বললাম, 'তাই কি? আমারও তো হয়নি। তবু বড় সুখে জীবনও কেটে গেছে। জীবন ভরা সুখ পাবি আর তার জন্য কিচ্ছু ছাড়বিনে? তাছাড়া সোমার বাবা কোনও আপত্তি করবে না। সোমা আমাদের সব বলেছে। আর আপত্তি করলেই যদি তুই পেছপাও হতিস্ তাহলে আমিও হতাশ হতাম।'

জয়ন্তী এক জায়গায় লিখেছে, 'শুনেছি বাড়িতে একটা বিয়ে হলে সে বাড়ির মঙ্গল হয়। এ-বাড়িতেও হয়তো আগেও কারও বিয়ে হয়েছে, তাই এখানে মঙ্গল আছে। আমার ছেলে শিবের এ বাড়িতে বিয়ে হল। সাহেবি পরিবারেও যে কত সাবেকি নিয়মে বিয়ে হয় তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আমি কিছু দেখিনি। বেয়াই এসে হাসি মুখে বলে গেলেন, "আপনি যাবেন আশা করছি না। ছেলের বিয়ে দেখতে নেই। তাহলে নাকি অমঙ্গল হয়। একথা আমার মা বলেছেন। আমি ও-সব কুসংস্কার মানি না। তবে বিয়ে বলে কথা।" তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিলাম। যাবার কথা আমার মনেও আসেনি।'

জয়ন্তী লিখেছিল, 'এ দুনিয়াতে কেউ কারও নয়। ভালোবাসার ধনটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেও সদাই হারাই হারাই করে প্রাণ হাহাকার করে। মনকে বলি ওরে ও মন, ও তোর ধন নয়। ভয়টা কিসের তোর, ওর ক্ষয় নেই লয় নেই। দে ছেড়ে ওকে, অমনি দেখবি বুকের মাঝে লুকিয়ে আছে।

এক সময় আমি ভেবেছিলাম আমার জীবনের সব সাধনা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। সংস্কৃত হাতড়ে বল পাইনা, ইংরিজি শিক্ষায় সুখ পাই না। মূর্তি পুজোয় বিশ্বাস নেই, সোনার ঠাকুর ফেলতে পারি না। এই সময় ডাক এল—ভগবান নিজের হাতে যেন আমার কোলে শিবকে আর রূপকে বসিয়ে দিলেন।'

এই পাতায় এক রাশি বেল ফুল আছে। এখনও আছে। তাদের

মিহি মিঠে গন্ধ নাকে আসে। আমি আমার ছোট্ট চন্দনকাঠের পাতা-মার্কাটি ঐখানে লাগিয়ে জয়কে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সে কাছে এলে, বলেছিলাম, 'না আমার শরীর খারাপ করছে না। আর আমার ঘুলঘুলিতে বিদেশি খুদে সাদা প্যাঁচা বাসা বেঁধেছে, তাও আমি জানি। তুই আমার জানলার কাছে বসে, আমার দিদিশাশুড়ির শাশুড়ি জয়ন্তী চৌধুরীর ডাইরির ঐখান থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দ্যাখ্। তারপর তোর সঙ্গে কথা আছে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে জয় বলেছিল, 'মা, জল খাবে, কাউকে ডাকব?' 'আরে না রে না। তুই ওটা পড়তো। ও তো কালি দিয়ে লেখা নয়। শিরার রক্ত দিয়ে লেখা—কি মুস্কিল সত্যি করে রক্ত দিয়ে নয়, পড়েই দ্যাখ্ না। আমি ততক্ষণ আমার এই বইটার ছবিগুলো শেষ করে ফেলি।' ওর দিকে আর তাকাইনি। পড়তে আধ ঘন্টার বেশি লাগেনি। একেবারে শেষের কটা পাতা। বোধগম্য হতে হয়তো আরেকবার পড়েছিল। তারপর বইটা আমার টেবিলে রেখে, আস্তে আস্তে আমার খাটে বসে, আমার হাত ধরে বলল, 'মা, আমি বুঝতে পারিনি। আমি জানতাম না। বুঝতে বোধ হয় চেষ্টা করিনি। সঞ্জয়কে ডেকে পাঠাও।' আমি বললাম, 'তাকে আসতে বলেছি। বলেছি তোর কোনও আপত্তি হবে না।' এ-কথা শুনে জয় হেসেই কুটোপাটি। আমার বৌমাও আপত্তি করেনি। সোমা একবেলা না খেয়ে শুয়ে থাকার পরেই তার মা মত দিল। এই তো জীবন। আজ যাতে সব তোলপাড় হয়ে ওঠে। মনে হয় বেঁচে থাকার ভিৎগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে, কাল তার কথা ভালো করে মনেই পড়ে না। ভেবে পাইনে কোথায় যায় সব: সমস্ত মায়া-মমতা কাটিয়ে, জ্ঞানবিদ্যা অসাধারণ প্রতিভা ফেলে রেখে দিয়ে, সেই যেটা নিয়ে সারা জীবন হেসে-কেঁদে আকুল হওয়া গেছে, তার দিকে একবারও না ফিরে, কোন অজানায় যাত্রা করে।

আমি তার জন্য প্রস্তুত। সুখ দিয়ে আমার আকণ্ঠ ভরা আছে।

ডাক এলেই কলম নামিয়ে চলে যাব। ছেলে বলল, 'কি ভাব এত, মা। তুমি হাল না ধরলে, আমরা তো কোথা থেকে কি করব ভেবে পাচ্ছিনে। সঞ্জয়ের একটা প্রকাণ্ড সায়ামীজ ক্যাট আছে। মার্চের আগে ফ্ল্যাট পাচ্ছে না।' আমি বললাম, 'এ আবার একটা সমস্যা নাকি? আর হাসাস্‌নি বাবা।'

জয়ন্তীর ডাইরিটা আমার ক্যাবিনেটে বন্ধ করে রেখেছিলাম। পরদিন আগাগোড়া আরেকবার পড়লাম।

ভাবি দুনিয়াতে নতুন বলে কিছু নেই। পুরনো বলেও কিছু হয় না। সব কথা কোনও দিন না কোনও দিন কেউ না কেউ বলে গেছে। সব দুঃখ আগেও কত মানুষের বুক ভেঙে দিয়েছে; পরেও আরও কত দেবে। সব সুখ পাওয়া হয়েছে, আবার হবে। আমাদের আমোদিনী হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। ওকে আমি অবিনশ্বর ভাবতাম, স্বার্থপর ভাবতাম। তা হবে না-ই বা কেন? ওর জন্য কে-ই বা কবে এতটুকু ভাবনা করেছে। মনে হতো বেশ করেছে, যেখানে যা পারে লুটে-পুটে নিয়েছে। ওর যা কিছু পছন্দ হয়েছে, সেটা অমনি গায়েব হয়ে গেছে। আমার কোনও দরকারি জিনিস খোয়া গেলে, আমি কাউকে কিছু না বলে, সবার আগে ওর জোড়াতালি দেওয়া হাতবাক্সটি খুলে জিনিস উদ্ধার করে নিয়ে আসতাম। ও কিছু লক্ষ্য করেছে বলেও মনেও হতো না। নিজেকে ঠেলে সামনে ধরত না, সরে থাকত, আড়ালে থাকত। কিছুই ওর মনের নাগাল পেত না; এই মুহূর্তে কারও সঙ্গে ঝগড়া করে, পর মুহূর্তেই হয়তো সেই শত্তুরেরই পায়ের হাজাতে ওষুধ লাগাতে বসল! সারাদিন খুরখুর করে কাজ খুঁজে বেড়াত। না পেলে, কাজ বানাত। আমার ছেলে জয়কে একটা গোটা ছুটির সপ্তাহ ভর শিখিয়েছিল কি করে ফালতু কাগজ জলে ভিজিয়ে মণ্ড করে, সেটাকে একটা ভাঙা প্লেটে ঢেলে, সেই আকারে কাগজের মণ্ডের প্লেট বানাতে হয়! সেটাতে অবিশ্যি কিছু রাখাও যেত না, নক্সা এঁকে

ঘর সাজানোও যেত না। কিন্তু কটা দিন ওদের আনন্দে কেটেছিল। তারও দাম কম নয়!

কারও কোনও বিপদ-আপদ,ব্যামো-ব্যাধি হলে ও দু-হাতে তার সেবা করত। নোংরা ফেলতে হলে, ময়লা কাপড় কাচতে হলে আহ্লাদে আটখানা! অবাক হয়ে ভাবতাম আহা, দেবার মতো কিছু, পায়নি। তাই নিজের হাতের সেবা দিয়ে মন ভালো করে।

আক্ষেপে মন ভরে আছে তাই এত কথা বলে ফেললাম। জয়ন্তী লিখেছে, 'ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। কোনও বিশেষ সময়ে, বিশেষ জায়গায়, কেউ উপস্থিত ছিল বলে রাগেই হোক, লোভেই হোক, একটা ভুল করে ফেলল অমনি তাকে বলি পাপী। আর দৈবাৎ সেখানে সে যদি না থাকত তাহলে দুষ্কর্মটি করত না, তখন সেই মানুষটাকেই সবাই বলত সাধু! এর মধ্যে কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। সুখে আছি, প্রলোভন কাকে বলে জানি না, অভাব নেই, সুযোগ নেই, আমি ভারী লক্ষ্মীমতী—'

সে যাই হোক, একদিন সকালে সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে বসেছি; মঙ্গল আমার চা দিয়ে গেছে। এমন সময় হাসি মুখে আমোদিনী উঠিপড়ি করে ছুটে এসে বলল, 'মা, আমাকে এদ্দিন পর ওনাদের মনে পড়েছে। আমি গেলাম।' মনে হল আহ্লাদ রাখার জায়গা পাচ্ছে না। এতদিনে বুঝলাম এককালে মুখখানি সুন্দর ছিল। আমোদিনী তার হারানো রূপরাশি ফিরে পেয়ে, কি যে করবে ভেবে না পেয়ে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। আর উঠল না। মুখটা তুলে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপরেই ঢলে পড়ল। আমার মনে বড় ভয় ছিল আমি চলে গেলে ওকে কে সামলাবে, সে সমস্যাটাও ঘুচিয়ে দিয়ে সে স্বর্গে গেল। যে বিধাতা ওকে আজন্ম বঞ্চিত করেছিলেন, এবার তিনি নিশ্চয় মচ্ছি ভেঙ্গে ওর কোল ভরে, মন ভরে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবেন।

জয়ন্তীর ডাইরির যে জায়গাটা জয়কে পড়তে দিয়েছিলাম,

সেইটে আবার পড়ি। ভাবি কোনও জিনিসের ধরা বাঁধা একটা রূপ থাকে না। একেক দিক থেকে একেক রকম দেখায়। অজস্র রূপ নিয়ে জন্মাই আমরা। আমার দিদিশাশুড়ি তাঁর কোণ থেকে যাকে দেখতেন, তার কথা ভুলতে পারতেন না। একদিন বলেছিলেন, 'ভাবতে পারিস ঐ বড় বাড়িতে ঐ একটা ছিপছিপে পাতলা মেয়েমানুষ কি পরম দাপটে রাজত্ব করত। কেউ ওকে কখনও গলা তুলে রাগমাগ করতে শোনেনি। একবার গম্ভীর মুখে চোখ তুলে তাকালেই হয়ে গেল! হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যেত রে। মনে হতো ওর ঐ টানাটানা চোখ দিয়ে আমার মনের ভেতরকার সব লুকনো কথা জেনে ফেলছে। কে জানে কোনও মন্ত্রতন্ত্র জানত কি না। ও যে স্যান্সক্রিটে ওরিজিনাল বেদ পড়ত সে তো নিজের চোখে দেখেছি। আমার ছেলে বলত, "গ্যাম্মা সব জানে। পণ্ডিতমশাই বলেছেন যা নেই বেদে তা ইউনিভার্সে কোথাও নেই।" শুনলি কথা। পিত্তি জ্বলে যেত, বলে আমার বাবা বিলিতি ডিগ্রি পাওয়া ছেলে; বছরে ক-মাস বিলেতের আপিসে থাকতেন, ডক্টর পি কে রায়ের প্যাল; স্যার কে জি গুপ্টার ফ্রেন্ড, সেটা কিছু নয়। বিদ্যের আধার হলেন ঐ গ্যাম্মা, যিনি কোনও ইস্কুলের চৌকাঠও মাড়াননি।'

জয়ন্তী লিখেছে, 'যতই দিন যায়, ততই বুঝি আমি কেউ নই, কিছু নই, ছকের ওপর বসানো ঘুঁটি ছাড়া কিছু নই। যেমনি চালান তেমন চলি। কিন্তু আমার জীবনের সব চাইতে ব্যর্থতার সময় তিনিই আমার জন্ম সার্থক করে দিয়েছিলেন। আজ সে-কথা এ বাড়ির বংশধরদের জানানো উচিত। গোড়া থেকে তাই খুলে বলি। আজ আমার ভয় নেই, লজ্জা নেই। আমার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি, সেখানে পৌঁছবার পাথেয়-ও পেয়েছি। এত বড় সৌভাগ্যের আমার কোনও যোগ্যতা নেই, তাও আমি জানি। আর আমার কোনও দুঃখ নেই; ভাবনা শুধু এই যেন আমি ব্যর্থ না হই।

মানুষের হাতের শ্রেষ্ঠ কাজ কোন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণালব্ধ শিল্পকর্ম, বা সঙ্গীত বা সাহিত্যকর্ম নয়; মানুষ তৈরির কাজের সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা হয়না।

নৈঃসঙ্গে, বিফলতায়, আশাভঙ্গে, যার জীবনের ছাব্বিশ বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল, কাজ ছাড়া তার কিসের ভবিষ্যৎ? তাই আমি কাজ বানাতাম। লেডিজ কমিটির মিটিং করতাম। পরদা স্কুল খুলতে সাহায্য করতাম। অনাথদের জন্য টাকা তুলতাম, গরম জামা বুনে দিতাম আর উড্ স্ট্রীটের এই পুরনো বাড়িটার সংস্কার করতাম। যাতে লোকে একে বলে এ বংশেরই বংশধরের যোগ্য আবাস। একমাত্র দুঃখ যে বাড়ির বাসিন্দাদের কোনও বংশধর নেই। মহারানি ভিক্টোরিয়া থেকে আরম্ভ করে, আমাদের পরাণ মালীর সকলেরই ঘরভরা ছেলেমেয়ে কলকল করে, খালি বড় বাড়ির ঘরদোর ফাঁকা।

কত সময় ভেবেছি শ্যামবাজারের শরিকদের কারও একটা ছেলে এনে মনের মতো করে মানুষ করি। এ-সবই তো যৌথ সম্পত্তি। কিন্তু তারা দেবে কেন আর আমার স্বামীই বা রাজি হবেন কেন? ও চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলাম। এই সময় বিলেত থেকে ছোট একখানি চিঠি পেলাম। অন্যান্য চিঠির মতো ইংরিজিতে লেখা ২ পাতা জোড়া বৈষয়িক চিঠি নয়। বাংলায় লেখা, তিনটি লাইন। "জয়ন্তী, আমি বড়ই আতান্তরে পড়েছি। তুমি ছাড়া কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।" আর কিছু নয়।

সমস্ত ব্যবস্থা করে ১০ দিনের মধ্যে রওনা হয়ে গেলাম। একা যাবার সাহস ছিল না। মিস্‌কে সঙ্গে নিলাম। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল না। নানা অছিলায় থাকার চেষ্টা করেছিলেন। আমি ছাড়িনি। বলেছিলাম, "তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। বাবার সঙ্গে ছোটবেলায় কাশী, হরিদ্বার, এমন কি কেদার-বদরীও গিয়েছি আর বিয়ের পর সিমলা গেছিলাম। বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমার ভয় করে। তাই শুনে মিস্ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিলেন, "ভয় করে? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

আমি বললাম, "লাগছে। শিরদাঁড়ায় জোর পাচ্ছি না।" আর কথা নয়। আমরা সরকার মশাইয়ের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে সেখান থেকে মিসেস্ সিডনস্ বলে আমার স্বামীর এক বন্ধুপত্নীর হেপাজতে ডোভারে গিয়ে নেমেছিলাম। আমার স্বামী সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে নিয়ে গেলেন। মিসের মুখে কথা নেই। যেন পাথরের মূর্তি। আমি হকচকিয়ে গেলাম।

ঐ গ্রামের এক সুন্দর নির্জন বাড়িতে একজন আসন্নপ্রসবা রক্তহীনা সুন্দরী মেয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল। মিস তাকে দেখে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। আমাকে কিছু বলে দিতে হয়নি। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ওকে বিয়ে করেছ?" ভগ্নকণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমাকে বিয়ে করেছি। আবার হেলেনকে কি করে করি!" বলেছিলাম, "আমাদের দেশে বহু নমস্য ব্যক্তিরা একাধিক বিয়ে করেছেন। কিন্তু এ দেশে রেজিস্ট্রি না হলে কোনও বিয়ে বিয়ে বলে মানা হয় না। স্পেশাল লাইসেন্স হলে নোটিসও দিতে হয় না। এখনই ব্যবস্থা করা যাক।"

আমি দাঁড়িয়ে থেকে ঐ মৃত্যুপথযাত্রিনীর সঙ্গে আমার স্বামীর বিয়ে দিয়েছিলাম। তার দিন আস্টেক পরে দুটি দেবপুত্রের মতো ছেলের জন্ম দিয়ে একবার আমার দিকে চেয়ে মধুর হেসে হেলেন যেন নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে গেছিল। মিস যেন পাথরের মূর্তি। হেলেন যে ওঁরই মেয়ে তাও শুনলাম। কেঁদে বলেছিলেন, "আমিই যেচে তোমার কাছে চলে গেছিলাম। আমার মেয়ে তোমাকে যে দুঃখ দিয়েছিল, তার জন্য যদি কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে পারি।"

আমি বলেছিলাম, "যা কোনও দিনও আমি পাইনি, তার বদলে ভগবানই আমার কোল ভরে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। আমার জীবন সার্থক হয়ে গেছে। যা আমার কোনও দিন ছিল না, তার জন্য লালায়িত না হয়ে, অযাচিত ভাবে যে ধন পেয়েছিলাম তাতেই আমার আকণ্ঠ ভরে আছে। দুঃখ রাখার এতটুকু জায়গা নেই।

আমার জন্ম সার্থক হয়ে গেছে।"

এই কটা কথা লিখতে আমার অনেক দিন লেগেছে। ভেবেছিলাম শিবের আগে রূপের যখন ১৮ বছর পূর্ণ হবে, ওদের পড়তে দেব। তার দরকার হয়নি। ডাইরিটা বের করতেই ওরা আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে তাকে তুলে রেখে বলেছিল, "ওসব আমরা কোন কালে পড়ে রেখেছি, ডার্লিং, কোথায় থাকো তুমি? একেকবার ভেবেছি গল্প লিখেছ বুঝি, তাই ড্যাডকেও জিজ্ঞাসা করছিলাম। এবার নতুন কিছু বল।" তখন আমরা তিনজনকে তিনজনা বুকে জড়িয়ে ধরে হেসে-কেঁদে একাকার করেছিলাম। তিনজনই বা বলছি কেন, ওরা ওদের ন্যানিকেও ডেকে এনেছিল। শুধু আমিই সুখী হইনি, ওদের ন্যানিও ওরা যতই বড় হতে থেকেছে, ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে, সূর্যমুখী ফুলের মতো ফুটে উঠেছিলেন। তিনি ঘুমের মধ্যে স্বর্গে গেলে পর, প্রতি মাসে ঐ দিনে পার্ক স্ট্রীটে ওঁর সমাধিতে একটি করে সাদা ফুল গোলাপ বা গন্ধরাজ আমরা গিয়ে রেখে আসি।

আমার মতো সুখী কে বা আছে? ওরা এখন বড় হয়ে গেছে; যে যার নিজের নির্বাচিত জীবন কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা অন্য কোনও মাটিতে হাঁটি, এ সংসারের মানদণ্ডের চল নেই সেখানে। ছেলেদের আমার কোলে দিয়ে, ওদের বাবা ব্যারিস্টারি পাস করে, ওদেশেই ইন্ডিয়া অফিসে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতেন আর প্রতি বছর দেশে এসে মাস দুই কাটিয়ে যেতেন। অবসর নিয়ে এখানেই থাকতেন। আমার কোলে মাথা রেখে ৭০ বছর বয়সে চোখ বুজেছিলেন। যাবার আগে বলেছিলেন, "পর জন্মে যেন দেখা পাই।" রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, "আমরা সবাই কলমি শাকের ঝাড়। ভালোবাসার সম্বন্ধগুলো জন্মে জন্মে টেনে নিয়ে বেড়াই।"

এমনি করে আমার ৮২ বছর বয়সে আমার দিদিশাশুড়ির

শাশুড়ি জয়ন্তী চৌধুরীর সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়েছিল। ভাবি কোনও জিনিসের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। ভোল বদলে সব কিছু বারে বারে ফিরে আসে। আজ যা অভিশাপ, কাল সেই আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। দুটি অসহায় শিশুকে কোল দিয়ে জয়ন্তীর জীবনের সব দুঃখ-ব্যর্থতা দূর হয়ে গেছিল। শতাধিক বছর আগে হাজার গুণী হলেও, অভিজাত বংশের মেয়েদের কাছে কর্মজগতের অনেক দরজাই বন্ধ ছিল। দিতে চাই, কোল ভরে দেবার মতো সন্তার আছে, কিন্তু নেবার কেউ নেই, এর চাইতে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে। বিধাতা জয়ন্তীকে সে দুঃখ দেয়নি।

ভাবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃখময় আঘাতে আমাদের দেশের মেয়েদের পায়ের শিকল কেটে গেছিল। আদর্শবাদীরা যা করে উঠতে পারেনি, সর্বনাশা যুদ্ধ এসে মাথার উপর থেকে আচ্ছাদনটি তুলে নিয়ে মেয়েদের পথে দাঁড় করিয়ে দিলে, তবে না তারা হৃদয়ে মুক্তির মন্ত্র পৌঁছত। তার আগে ইউরোপের মেয়েদের অধিকার কত সীমিত ছিল। গুণ আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে-সবকে কাজে লাগাবার উপায় নেই।'

দিদিশাশুড়ি একদিন বলেছিলেন, 'তোরা বেশ আছিস রে নাত বৌ। নিজের কাছে নিজেকে ঋণী থাকতে হয় না। লিখিস, ছবি আঁকিস, তার জন্য কত সম্মান পাস। আমাদের কোনও সম্মান ছিল না রে। তবে রান্নাঘরে দাসীগিরিও করতে হয়নি।' হেসে ছিলাম। 'ও দিদিমণি, কোনও কোনও সায়েব মেমদের দেশেও পুরুষরা ২১ বছরে ভোট দেয়। মেয়েরা দেয় ৩০ বছরে। আর তাই যদি বলো কোন স্বাধীন দেশেরই বা মেয়েদের অবদান পুরুষদের সমান?' আমার তো মনে হয় কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সাধারণ মেয়েদের কাজ হল রক্ষা করা আর পুরুষদের কাজ হল সৃষ্টি করা। কি জানি দুনিয়ার বহু অসাধারণ প্রতিভারও মেয়েরা উত্তরাধিকারিনী। সুযোগ না পেয়ে হয়তো অনেক সময় জং ধরে

যায়। কিন্তু যাঁরা কাজে নামেন, তাঁদের আর সব কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

সল্ট লেকে অনেক আধুনিকা আছে। কেউ সংবাদপত্রের আপিসে কাজ করে, কেউ বা ব্যাংকে, কেউ বিজলি বা টেলিফোন আপিসে। বিয়ে হয়নি বলে সকলের মা বাপের কি আক্ষেপ। মনে আছে ৬০ বছর আগে ঐ ঠাকুর বাড়িরই এক দৌহিত্রী আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়াতে গেছিল মিনি মাগনা। এদিকে ওরা সে-রকম কিছু বড়লোক ছিল না। ওর দাদা বলেছিলেন 'আমরা ঐ একটা বোনকে প্রতিপালন করতে পারব না, এ-কথা বললে বাড়ির সব পুরুষদের অসম্মান করা হয়।' কিছু বলিনি, মনে ভেবেছিলাম বরং ঐ কথা বললে মেয়েদের অসম্মান করা হয়। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ তার কিশোরী ভাইঝিকে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে সরস্বতী ঠাকরুণের ভূমিকায় নামিয়ে একটা সামাজিক আলোড়নের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আরেক ভাইঝি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লোরেটোতে পড়ে স্নাতকত্ব পেয়েছিলেন। তবু মেয়েদের দাসত্ব ঘোচেনি। যত দিন না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাদের অনেকের আশ্রয় আবাস ঘুচিয়ে পথে বের করে দিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। তখন নিজের চোখে দেখেছিলাম ৫০ বছরের অগ্রগতি কেমন দিব্যি সুন্দর ১ বছরেই সম্পন্ন হয়ে গেল।

ভাবি যা যা চাইতাম সব হাতের মুঠোর মধ্যে এল, তবু কেন মানুষ সুখী হতে পারছে না? দেশ স্বাধীন হল; মেয়েরা মুক্তি পেল; স্বদেশী জিনিসের ছড়াছড়ি হল; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলোর সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করি। তবু কেন মহান হতে পারি না। মহাপুরুষরা কি আর এ দেশে জন্মান না? জ্ঞানী আছেন, গুণী আছেন, ধর্মনেত্রীও কখনও কখনও দেখা দেন। তবু কেন পৃথিবীময় সুখ সুখ করে সবাই ছুটে বেড়াই। ভাবি সুখ কাকে বলে? কোথায় গেলে তাকে পাব? আমার তো মনে হয় আমার আকণ্ঠ সুখে ভরে

আছে। ঐ যেমন জয়ন্তী বলেছিল, আমিও তেমনি দুঃখ জমা করে রাখার জায়গা কোথায় পাই? সুখগুলো হাত পেতে নেব, ভাবব এ আমার ন্যায্য প্রাপ্য, আর দুঃখ পেলেই হাহাকার করব? যে কারণে দুঃখ পেয়েছি, তাকে তো আর নেই করে দিতে পারব না। আবার তাকে মনের মধ্যে জমা করে নিত্যি নতুন করে দুঃখ পাব, আমি তাতে রাজি নই। মন থেকে দূর করে দিই। কিছুদিন পরে যা পেয়েছি তার তুলনায় যা পাইনি তাকে তুচ্ছ বলে মনে হয়।

আমার কাছে আমার জীবন যা, ট্যাফির কাছে তার জীবন-ও তাই। আজকাল আবার একটা বুড়ো দাঁড়কাক আমার ঝোলানো বারান্দায় বাস করে। আর সব সময় হেঁড়ে গলায় খুক খুক করে হাসে। কোথায় কি খেয়ে আসে জানি না। আমাদের খায়ও না, পরেও না। মরা জিনিস খায় না ওরা জানি, কোথায় কোন হতভাগ্য ব্যাঙ, না নেংটি ইঁদুর, না অন্য পাখির ছানা খেয়ে আসে জানি না। নিশ্চয়ই নিষ্কাম ভাবেই খায়, নেহাৎ জীবন-ধারণের তাগাদায় খেতে হয়, তাই। নইলে অমন দার্শনিক ভাবটি পেল কোত্থেকে। ভাবি কতজনার সর্বনাশের উপর একেকটি প্রাণীর সুখ নির্ভর করে।

ভাবি ৮২ বছর বয়স হল, যাবার জন্য পাথেয় জমা করে ভারাক্রান্ত হব না। ডাক এলেই খালি হাতে চলে যাব। জয়ন্তীও নাকি ঐ রকম করেই চলে গেছিল, দিদিশাশুড়ির কাছে শুনেছি। নাকি কোনও রোগভোগ হয়নি, এক দিনের জন্যেও শুয়ে থাকেনি। মিসের ছাড়া কারও সেবা নিতে হয়নি। সারা জীবনে বার তিনেক গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসকে পাঠিয়ে পাশের গলির ডক্টর মলিসনের নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করেছিল। ছেলে দুটো নাকি বারে বারে খবর নিত, ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরের ঘরে হাঁড়ি মুখ করে বসে থাকত। বড় নার্স মিস হ্যারিস নাকি বলতেন— 'এ পেশেন্টের কোনও বিপদ হবে না, দুটো দুটো এঞ্জেল পাহারায় বসেছে।' অনেক দিন পরে চলে গেলেন যখন, ছেলেরা তখন

আধবুড়ো। দিদিশাশুড়ির কাছে শুনেছি, নাকি রোগ নেই, কিছু নেই, তবে বয়সটা প্রায় ৮০। উনি নাকি ভাবতেন বুড়ি অমর, সবাইকে পার না করে সহজে নড়বেন না। সেদিন সকালে অভ্যাসমতো খবর না দিয়ে রূপ এসে মায়ের সামনে দাঁড়াতেই, শিবও এল। মা হেসে বললেন, 'এসেছিস বাবা? আমি চললাম।' বলে দুহাত বাড়িয়ে দুজনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওদের বুকে এলিয়ে পড়লেন। ছেলেরা কাঠ। চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। এ-ওর দিকে চেয়ে রইল। যা যা করণীয় সব করা হয়েছিল। আত্মীয়-স্বজন সবাই এসেছিলেন। রূপ ঐ বাড়ির অতিথিশালায় ১৫ দিন থেকে, শিবকে এক মাসের জন্য হিমালয়ে নিয়ে গেছিল। দিদিশাশুড়ির দুই বোন এসে এই প্রথম অনেক দিন থেকে গেছিলেন। নাকি বলেছিলেন, 'বাবা! এই প্রথম এসে থাকার সাহস পেলাম।' পরে দিদিশাশুড়ি বলেছিলেন, 'আমি যে কি হারালাম তা ওরা বুঝবে কি করে। আর জন্মে যেন আবার অমন মা পাই।'

এই হল আমার খাতা বন্ধ করার সময়। বলেছিতো এ গল্পের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।